ভয়ঙ্কর সেই অভিযান

রত্না, মিঠু এবং বাবুল-কে,

বাবা

ভয়ঙ্কর সেই অভিযান

সমরজিৎ কর

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন বল
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

গ্রন্থসত্ত্ব : শীলা কর

প্রথম প্রকাশ : শুভ মহালয়া ১৩৬৮

মুদ্রাকর :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

অদ্ভুত সেই শব্দ।

বরং বলি শিস্‌!

ব্যাপারটা প্রথম শুনলাম একটি বিদেশী জাহাজের জনৈক নাবিকের কাছ থেকে।

ভদ্রলোক বললেন, সে শিস্‌ যে কী দারুণ ভয়ঙ্কর, কী প্রচণ্ড এক বিভীষিকা সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, আপনার নামটা, স্যার—?

ডঃ বাসু। সংক্ষেপে এই ভাবেই তাঁকে আমার পরিচয়টি দেবার চেষ্টা করলাম।

তিনি বললেন, মাফ করবেন, ডঃ বাসু। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বায়ার্ডের সেই বরফের রাজত্ব নিজের চোখে দেখার মত দুর্ভাগ্য নিশ্চয় এখনও পর্যন্ত আপনার হয় নি?

না। আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ভাল। না হলেই ভাল। তবে আমার হয়েছে। মাত্র একবার। কিন্তু সেই একবারেই আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান বলে যতই বড়াই করুক, প্রকৃতির কাছে এখনও সে শিশু। প্রকৃতির আগ্রাসী শক্তিকে কোন দিনই সে জয় করতে পারবে না, ডঃ বাসু। —আপনার নামটা আমি ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারলাম তো, ডঃ বাসু?

বললাম, ঠিক আছে। আপনি নিখুঁত উচ্চারণ করেছেন।—হ্যাঁ আপনি সেই শিসের কথাটা বলছিলেন না? মানে—

বলছি। সব আপনাকে বলব। আপনাদের কলকাতায় এখন আমার অফুরন্ত অবসর। মনে হচ্ছে না আগামী সাতদিনের মধ্যে কলকাতা বন্দর ছাড়ার অনুমতি পাব। এখন জরুরী অবস্থার মধ্যে

বন্দরের মত নিরাপদ জায়গা ছেড়ে যাওয়াটা মস্ত বড় একটা ঝক্কিও বটে। তা হোক। এ শহরটাকে আমার ভাল লাগছে। ভদ্রলোক কতকটা আত্মগত ভাবেই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন।

মুহূর্তের জন্যে বিরতি।

তারপর নিজে থেকেই বললেন, ভাল কথা, আমার পরিচয়টা আপনাকে দিয়ে নিই। আমার নাম—। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান জাহাজ পেঙ্গুইন-এর আমি ক্যাপ্টেন।

ভদ্রলোক ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজিতে যা উচ্চারণ করলেন, বার পাঁচেক চেষ্টা করেও নিজের জিভে তা আমি উচ্চারণ করতে পারলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম, তাঁর বিরাট নামের একটি শব্দ আলবার্ট।

নিজের অক্ষমতা জানিয়ে তাই আমি বললাম, মাফ করবেন। আপনাকে যদি আমি ক্যাপ্টেন আলবার্ট বলে ডাকি, আপনি কি আপত্তি করবেন?

আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন। বললেন, অবশ্যই না। বুঝতে পারছি, নামটা কেমন বেখাপ্পা রকমের, তাই না? এই হল গিয়ে মস্ত বড় একটা মুস্কিল। মানে বিদেশীদের নাম উচ্চারণ করাটা। কোন আপত্তি নেই, আমাকে আপনি আলবার্ট নামেই ডাকুন না।

বলতে কি, যতই তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, অদ্ভুত রকম ভাল লাগছিল। এক ধরনের মানুষ আছে, পরকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের অপরিসীম। মনে হল আলবার্ট ঠিক তেমনই একজন। নাটকীয় ভাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু প্রথম পরিচয়েই আমরা যেন পরস্পর আত্মজ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু সেই শব্দ? সেই শিস্? ক্যাপ্টেন আলবার্ট যার কথা বার বার উচ্চারণ করছিলেন, তার কী হল?

সে সব কথা একটু পরে বলছি। তার আগে কী ভাবে ক্যাপ্টেন

আলবার্টের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সেটা আপনাদের জানা দরকার। বলতে পারেন সেও যেন একটা নাটকীয় ঘটনা।

১৯২৮ এর ডিসেম্বরের সেই দিনটি এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে। আন্তর্জাতিক একটি সংস্থা ওই সময় মরিসাসের কাছাকাছি সমুদ্র অঞ্চলে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালাচ্ছিল। কথা ছিল ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমিও তাতে অংশ গ্রহণ করব। কিন্তু দেশে তখন জরুরী অবস্থা। বাংলা দেশের মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করতে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। যাত্রার সমস্ত যখন ঠিক ঠাক, হঠাৎ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে জানান হল, পররাষ্ট্র দপ্তর আমার বিদেশ সফর বাতিল করেছেন। ফলে কলকাতায় থেকে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

কাজের মধ্যে তখন লাইব্রেরীতে বসে বই পড়া। সেই সঙ্গে মাস দুই আগে মহাকাশে এক্স-রে বিকিরণ নামে যে বইটি লেখার কাজ শেষ করেছিলাম, ছাপতে দেবার আগে সেটির পাণ্ডুলিপির ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম।

তবু এত করেও সময় যেন আর কাটছিল না।

ঠিক এমনই একটি সময়ে, যতদূর মনে পড়ে, তারিখটা সম্ভবতঃ ২৮ ডিসেম্বর। হাতে কোন কাজ না থাকায় পুরনো অভ্যেসবশতঃ বিকেলের দিকে পার্ক স্ট্রীটের একটি অভিজাত রেস্তোঁরায় এসে আশ্রয় নিলাম। বলতে পারেন এ আমার একটা পুরনো রোগ। কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই কোন বার বা রেস্তোঁরায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকার লোভ কোন দিনই আমি সামলাতে পারি নি। তেমন কোন সুযোগ পেলে কোন রকম সঙ্গী না নিয়ে সেখানে চলে যাই। একান্তে একটি আসন দখল করে বসি। এক কাপ চা অথবা কফি। অথবা

এক বোতল ঠাণ্ডা বীয়ার। এই নিয়ে বসে থাকি। যতক্ষণ পারা যায়। আর নিবিষ্ট হয়ে দেখি কত লোক সেখানে আসছে। বসছে। কথা বলছে। তরুণ-তরুণী। বয়স্ক-বয়স্কা। বিচিত্র তাদের সংলাপ। কেউ প্রেম নিবেদন করে। কেউ ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলে। অথবা রাজনীতি। মানুষ যে কত রকমের কথা বলতে পারে। যে কোন রেস্তোঁরা বা বারে কিছুক্ষণ নীরবে কান পেতে থাকলে আঁচ করা যায়। আমি সমাজবিজ্ঞানী নই। বলতে পারেন এটা আমার বাতিক।

যে রেস্তোঁরাটির কথা বলছি, সেদিন সেখানে তেমন ভীড় ছিল না।

জন পাঁচ সাত লোক। এদিক ওদিক ছড়িয়ে। একা, অথবা জোড়ায়। সবাই নিজের মধ্যে নিমজ্জিত।

ওয়েটার আমাকে চিনত। আমাকে দেখেই নিয়মমাফিক কোণের দিকের একটি আসন দেখিয়ে দিল।

এক কাপ কফি। ওয়েটারকে বললাম।

কফি এল।

আমি আত্মমগ্ন হলাম।

জানি না কতক্ষণ সেই ভাবে কেটেছিল।

হঠাৎ কার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে একজন বিদেশী। মনে হল ইউরোপীয়। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। নাবিকের সাদা পোশাক। মুখ দেখে বয়েস অনুমান করা শক্ত। তবে মনে হল পঞ্চাশ এবং ষাটের মাঝামাঝি একটা কিছু হবে। রেস্তোঁরার আলো আঁধারী পরিবেশে আর কিছু ঠাহর করা যাচ্ছিল না।

নাবিকটি অভিবাদনের ঢং-এ মাথা নুইয়ে বললেন, কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে একটু বিরক্ত করছি।

না, না, সেকি? কী ব্যাপার বলুন তো?

সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোককে এ ভাবে কথা বলতে দেখে খানিকটা বিব্রত বোধ করলাম। কিছুটা আত্মমগ্ন ছিলাম হয়ত, তাই চমকেও উঠেছিলাম।

মাথা নুইয়ে প্রত্যাভিবাদনের ঢং-এ বললাম, বসুন।

ধন্যবাদ। বলেই নাবিকটি আমার সামনের চেয়ারটায় বসলেন।

বলুন কী ব্যাপার। আমার জিজ্ঞাসা।

আমার কথায় ভদ্রলোক একটু হাসলেন যেন। তারপর বললেন, ছেলেমানুষী মনে হবে আপনার কাছে। তবে বুঝতেই তো পারছেন, বিদেশে গেলে এমন বিপদে কে না পড়ে, বলুন? বলেই তিনি একটা সাদা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এই যে—দয়া করে এটা দেখে সবটা আমাকে বুঝিয়ে দিন তো?

রেস্তোঁরার একটা বিল।

বলুন তো, এবার আমি হাসব, না কাঁদব? ভেবেছিলাম, কী না কী সমস্যার কথা হয়ত তিনি জিজ্ঞেস করে বসবেন। কিন্তু সে সব কিছু নয়। একটা বিল। এতক্ষণ ধরে এখানে বসে কী কী তিনি খেয়েছেন, কার কত দাম তাতে লেখা। সে সব দেখে আমার কী হবে?

ভদ্রলোকের মুখের ওপর শিশুসুলভ হাসি।

এইমাত্র নতুন দু'জন ভোজনার্থী এসে ঢুকলেন। দরজা ফাঁক করে ঢোকার সময় মুহূর্তের জন্যে এক ফালি নির্ভেজাল সূর্যের আলো এসে পড়ল আমার সামনে বসা আগন্তুকটির মুখে।

কী বলব, সে মুখ মুহূর্তে আমাকে জয় করে নিল।

একটু বিরতি।

রেস্তোঁরার বিলটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখলাম, তা গোটা ছয়েক পদ খেয়েছেন—পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী মিলিয়ে। পানীয় হিসেবে খেয়েছেন আমের সরবৎ। খাবারের যা তালিকা, দেখে মনে হল আমি আসার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে এখানে তিনি এসেছেন।

এ খাবারগুলি আপনি চেনেন ? তাঁর প্রশ্ন।

পাগল নাকি ? চিনব না ? আমার দেশের খাবার, কত কালের সব চেনা মুখ। এতে কোন সন্দেহ আছে নাকি ?

কেন বলুন তো ? আমার প্রশ্নে সন্দেহ।

না। তেমন কিছু না। নাবিকটি বললেন।—মানে ভারতে এই প্রথম এলাম। এখানকার খাবারগুলির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। দয়া করে এ সব খাবারের কোনটির কী দেশী নাম, কত দাম, কী ভাবে তৈরী, যদি একটু বলেন, আমি নোট করে নিই। জানেন তো, কসমোপলিটান শহরের বড় বড় রেস্তোঁরা তাদের খাবারের নামগুলিকে বড় বিকৃত করে। পরিচিত নামের বদলে এমন সব বিদঘুটে নাম জুড়ে দেয়— ! আমাদের মত লোকেদের বিপদেই পড়তে হয়।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি তাঁর কথার কোন খেই ধরতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

ব্যাপারটা তিনিও আঁচ করলেন।

বললেন, আপনাকে খোলসা করেই বলি। জাহাজে কাজ করছি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীর কত ঘাটেই না জাহাজ ভিড়িয়েছি। আর যখন যেখানে গেছি, সেখানকার খাবার চেখে দেখার স্বাদ না মিটিয়ে ছাড়ি নি। বলতে পারেন, আমি ভোজন বিলাসী। শুধু বিলাসী নয়। আমার মস্ত নোট বুক দেখলে বুঝবেন, তাতে কত দেশের কত রকমের খাবারের নামই না লেখা আছে। কী ভাবে সে সব খাবার তৈরী হয়, তাদের স্বাদ, কারা সে সব খাবার প্রবর্তন করেন, সব কিছু তাতে পাবেন।

বুঝলাম, ভদ্রলোক পাগল নয়। এ তাঁর এক ধরনের হবি। বিভিন্ন দেশের খাবারের নাম টুকে রাখা। দেশীয় মুদ্রায় এবং নিজের দেশের মুদ্রায় তাদের দাম। নিজের দেশের মুদ্রায় দামটা কত পড়বে—যখন যেখানে যান জেনে নিয়ে টুকে রাখেন।

প্রথম পরিচয়েই ভদ্রলোকের ব্যাপারে বেশ খানিকটা কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

আমার নাম,—ভাঙ্গা ইংরেজী উচ্চারণে নিজের নামটি বললেন তিনি।

মাফ করবেন। কী যে বললেন, বুঝতে পারলাম না। শুধু নামটির মধ্যিখানের একটি শব্দ যে আলবার্ট সেটা ধরতে অসুবিধে হল না।

মৃদু হেসে বললাম, আপনার নামের আলবার্ট অংশটুকু আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। আমাদের এক কবি মধুসূদন দত্তের এক ছেলের নাম ছিল আলবার্ট।

দ্যাটস্ স্প্লেনডিড! যেন খুশী হলেন তিনি।

আমি যদি আপনাকে আলবার্ট নামে সম্বোধন করি, কোন আপত্তি আছে? আমার প্রশ্ন।

মোটেই না, মোটেই না। ভদ্রলোক সম্মতি জানালেন।

আমি ডঃ বাসু। পদার্থ বিজ্ঞানী। এবার আমি নিজের পরিচয় দিই।

কোয়ায়েত ইন্তারেস্তিং। তাঁর মন্তব্য।

বললেন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান জাহাজ 'পেঙ্গুইন'-এর আমি ক্যাপ্টেন। গতকাল বিকেলে প্রথম এখানকার বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছি। আজ এই প্রথম শহরে এলাম! বড় শহর। বিচিত্র লোকজন। কত রকমের পোশাক।

ক্যাপ্টেন আলবার্ট এমন ভাবে কলকাতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, যেন মনে হল আমি একটি উপন্যাসের পাতার বর্ণনা শুনছি।

বললেন, আমার তো দেশ ঘুরে বেড়ান পেশা,—বেশির ভাগ দেশের মানুষগুলি সাধারণতঃ একই ধরনের পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এখানে দেখছি কেউ বড় বড় কাপড়ের আস্তরণে শরীরের অর্ধাঙ্গ ঢেকে চলেছেন, মেয়েরা আরও বড় কাপড় দিয়ে গোটা শরীরটাই ঢেকে রেখেছেন—কারোর মাথায় পাগড়ী—

কারণ, এক এক প্রদেশের এক এক ধরনের সাজপোশাক। আমার মন্তব্য।

রেস্তোঁরার বিলটি তখনও আমার হাতে ধরা।

বিলটির ওপর চোখ বুলিয়ে বললাম, এই দেখুন, এটাকে বলা হয় মোগলাই পরোটা—পাঞ্জাবী, বা মুসলমানী খাবার। এটার নাম ধোসা। মাদ্রাজী খাবার—

কথার ফাঁকে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি টুকে নিই।

বলেই ক্যাপ্টেন আলবার্ট পকেট থেকে একটা ডায়েরী বের করে খস খস করে লিখতে শুরু করলেন। খাবারগুলির নাম, কী দিয়ে সে সব খাবার তৈরি, ভারতীয় মুদ্রায় তাদের দাম, ইত্যাদি।

তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল। দিল খোলা লোক। হাতে কাজ কর্ম নেই। জন-বিরল রেস্তোঁরা। আলো আঁধারী পরিবেশ। স্টেরিও ফোনিক রেকর্ডে কী একটা যেন স্প্যানিস সঙ্গীত বাজছিল। ধীর লয়ে গান। বিস্তীর্ণ শান্ত সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া শান্ত বাতাস যেমন সন্তর্পণে তার স্পর্শ জানিয়ে যায়, মনের ওপর সেই গান যেন তেমনি একটি রেশ সৃষ্টি করেছিল। আর এ সবের সঙ্গে মিলে সুদূর নরওয়ের এক পরিণত বয়স্ক জাহাজী ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বিচিত্র সংলাপ—এমন পরিবেশে সময় যে দ্রুতগামী হয়, সে তো সবাই জানেন ?

আলবার্টের চালচলনেও তাড়ার কোন লক্ষণ দেখলাম না। বরং ভাবটা এমন, চলুক না গল্পের ফোয়ারা। দু'জনই আমরা পরস্পরের মধ্যে হাবুডুবু খাই।

শিস্।

একটা মৃদু শিসের শব্দ।

শব্দটা কানে যেতেই আলবার্ট হঠাৎ যেন থেমে পড়লেন।

বরং মনে হল কেউ যেন তাঁকে থামিয়ে দিল।

কি হোল ? আমি কথা বললাম।

শিস্‌টা আর একবার শোনা গেল।

না। তেমন কিছু নয়, এ ধরনের রেস্তোঁরায় এ তো নৈমিত্তিক ঘটনা।

দূরে এক কোণে একটি ছেলে। ছোট্ট একটি টেবিলের সামনে বসে। এই মাত্র একটি মেয়ে ঢুকল রেস্তোঁরায়। ছেলেটি তাকে দেখেই হয়ত মৃদু শিস্ দিয়েছে। পরিচিত বন্ধু হয়ত।

আমার অনুমানই ঠিক।

ছেলেটির মেয়ে বন্ধু।

শিস্ দেওয়া ছেলেটির কাছে মেয়েটি গিয়ে বসল।

টু ব্যাড ! আলবার্টের মন্তব্য।

কী ? আমার প্রশ্ন।

ওই শিস্।

এবার শুরু হল 'শিস্' প্রসঙ্গ।

ডঃ বাসু, আপনি তো পদার্থবিজ্ঞানী, তাই না ? হঠাৎ একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলেন আলবার্ট।

কেন বলুন তো ?

কী নিয়ে গবেষণা করছেন এখন ? আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বরং পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন তিনিই।

মহাকাশের শব্দ তরঙ্গ।

বলেন কি, আপনিও শব্দ নিয়ে গবেষণা করছেন ? ডাঃ নাগুচিকে আপনি চেনেন ?

খুবই পরিচিত নাম। জাপানের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। মহাকাশে কী যেন এক ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আবিষ্কার করে ভদ্রলোক রীতিমত

সাড়া জাগিয়ে ফেলেছেন। আপনার সঙ্গে তাঁর কীভাবে পরিচয় হোল? সত্যিই এবার আমি বিস্মিত হলাম।

মৃদু হাসলেন ক্যাপ্টেন আলবার্ট।

অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তিত্ব। আবেগের রাশ টেনে ধরে কারও হৃদয় কী ভাবে স্পর্শ করা যায়, তিনি তা ভাল ভাবেই জানেন।

আমি জানি তাঁকে। বললেন আলবার্ট।

এবার আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

আর বলবেন না। বছর দুই আগে ওসাকা বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছি। হঠাৎ আমার কোম্পানির বড় কর্তার জরুরি চিঠি। শুরু করলেন আলবার্ট।—কর্তা কী লিখেছেন, জানেন? পেঙ্গুইনের একটি কেবিন যেন গুছিয়ে গাছিয়ে রেখে দিই। একজন বিজ্ঞানী এবং তাঁর সহকারী কী সব গবেষণার জন্যে পেঙ্গুইন-এ সোয়ারি হবেন।

আপনাদের তো পণ্যবাহী জাহাজ। আমার সকৌতুক প্রশ্ন।

আমিও তো তাই বলছি। আলবার্ট বলে যেতে লাগলেন: —আমাদের কিনা মাল বওয়া কাজ। কার্গোশিপ হল গিয়ে পেঙ্গুইন। যাত্রীবওয়া জাহাজের তেমন কোন সুব্যবস্থা তাতে নিশ্চয় থাকার কথা নয়। তবু ব্যবস্থা যতদূর করতে হল। আর তার দিন তিনেক পর জাহাজ ছাড়ার আগ মুখে এসে হাজির হলেন সেই ভদ্রলোক—মানে আপনাদের সেই ডঃ নাগুচি এবং তাঁর সাগরেদ—। —মাফ করবেন, ডঃ বাসু। 'সাগরেদ' কথাটা বলা এখানে উচিৎ হবে না। আসলে আমরা হলুম গিয়ে মুখ্যু মানুষ। ভাষা জ্ঞান কম।

পেয়ালার কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওয়েটারকে ডেকে এক পট কফির অর্ডার দিলাম।

ক্যাপ্টেন আলবার্ট, এক কাপ কফিতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি হবে না? বললাম আমি।

মোটেই না, মোটেই না। ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে কথা বলতে

আমার ভাল লাগছে। বলেই একটু থামলেন তিনি। তারপর বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার সময় আমি নষ্ট করছি না তো ?

না, না, সে কি ? ভালই তো লাগছে। হ্যাঁ, ডঃ নাগুচির ব্যাপার কী বলছিলেন যেন ? আমার প্রশ্ন।

ঠিক কথা। বড় ভাল লোক, মশায়। শুনলাম উনি আমাদের কোম্পানিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আকাশের বিদ্যুৎ না কী নিয়ে যেন গবেষণা চালাচ্ছিলেন তিনি। ওসাকা থেকে আমাদের কলম্বো যাওয়ার কথা, কোম্পানি একটি বড় সড় ক্যাবিন তাঁর জন্যে বরাদ্দ করে। জাহাজে এসে, কী বলব মশায়, পুরো ক্যাবিনটাকে তিনি এবং তাঁর সঙ্গী কী নাম যেন,—না, ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না। তাঁরা দু'জনে মিলে কত রকমের যন্ত্রপাতি দিয়ে যে ক্যাবিনটা সাজিয়ে ফেললেন।—বাপের জন্মে অমন সব যন্ত্রপাতি কখনও দেখি নি। পরে শুনলাম, কলম্বো যাওয়ার পথে মাঝ দরিয়ায় ওই যন্ত্র দিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ করবেন। এই কাজের জন্যে আমাদের কোম্পানি তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ওয়েটার কফির পট রেখে গেল। দুটো কাপে কফি ঢালার জন্যে আমি তৎপর হলাম।

দয়া করে আমারটাতে চিনি এবং দুধ দেবেন না, ডঃ বাসু।—

বললেন আলবার্ট।

ঠিক আছে। আমার জবাব।

কফি তৈরী হল।

শুরু হল আলবার্টের গল্প।

শুনুন তা হলে। ডঃ নাগুচি এবং তাঁর সঙ্গী প্রায় মাস খানেক আমাদের জাহাজে ছিলেন। পেনাং-এ আসার পর খানিকটা মেরামতি কাজের জন্যে কয়েকটা দিন আমাদের বাড়তি অপেক্ষা করতে হল। পেনাং থেকে এলাম হংকং। এখানে ডঃ নাগুচি এবং তাঁর

সঙ্গী বিদায় নিলেন। বিদায় নেবার আগের দিন রাতে তাঁর সঙ্গে ভাল-ভাবে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। এতদিন দিনে এক-আধবার ছাড়া বড় একটা কথাবার্তা তিনি বলতেন না দেখেছি। নিবিষ্ট হয়ে শুধু কাজ করে গেছেন। জাহাজের ডেকে থালার মত সব কী যেন —কতকটা রেডারের মত। কখনও দিনে কখনও রাতে তাঁর সঙ্গী সেই থালাগুলিকে কখনও উত্তর, কখনও দক্ষিণ আকাশের দিকে মেলে ধরত। আর ডঃ নাগুচি যন্ত্রপাতির সামনে বসে মাপজোখ করতেন কী যেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। যাবার আগের দিন বললেন, ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। আপনার আতিথেয়তা এবং সাহায্য না পেলে আমরা কাজ করতে পারতাম না। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। জাহাজ নিয়ে তো আপনাদের সারা পৃথিবীটাই চষে বেড়াতে হয়। তাই বলছিলাম আর কি। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকটা একটু বাঁচিয়ে চলবেন। মানে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে যে পথ ধরে কখনও সখনও আপনারা উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে যান ঠিক সেদিকটার কথাই আমি বলছি, ক্যাপ্টেন।

কেন, বলুন তো? হঠাৎ এমন অযাচিত উপদেশ শুনে বিরক্ত এবং কৌতূহলী দুই-ই হলাম। বললেন আলবার্ট।

অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ-তরঙ্গ ও দিকটায় দানা বাঁধা থাকে মাঝে মাঝে। মানে বাঁধা উচিৎ। পেনাং থেকে হংকং আসার পথে আমার যন্ত্রপাতি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত এক ধরনের চৌম্বক তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছে। তেমন জোরাল তরঙ্গ অবশ্য নয়। তবে আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতেই হবে, পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে পঞ্চাশ ডিগ্রী অক্ষাংশ বরাবর যে শব্দ তরঙ্গের কথা আমি বলছি, তার সাক্ষাৎ পাওয়াটা অনিশ্চিত হবে, আমি তা মনে করি না।

বলতে কী, কী যে তিনি বলতে চাইছিলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মশায়, আমি তো আর বিজ্ঞানী নই। বলতে বাধা

নেই, আত্মগত ভাবেই ডঃ নাগুচি কথাগুলি বলে যাচ্ছিলেন তাঁর শ্রোতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই। থাপছাড়া ভাবে দু' একটা কথা শুধু মনে আছে। যেমন, দক্ষিণ চৌম্বক মেরু, তার কাছে চৌম্বক বলরেখার ঘূর্ণী, মহাকাশ থেকে ভেসে আসা তেজস্ক্রিয় রশ্মির বর্ষণ, তার ফলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি। সেই তরঙ্গ এবং চৌম্বক বলরেখার মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, এমন অনেক কথা, ডঃ নাগুচি বললেন ; বললেন, এই প্রতিক্রিয়ার প্রসার হংকং-এও ধরা পড়েছে, তবে মাঝে মধ্যে।

তাতে আমার কী হল ? আমার প্রশ্ন।

শুধু আপনার নয়। আপনার জাহাজের সবারই ক্ষতি হতে পারে। ডঃ নাগুচি বললেন।

কী রকম ? এবার সত্যিই আমি যেন ঘাবড়ে গেলাম।

শব্দ ! হ্যাঁ, এর ফলে দু রকমের শব্দ আপনি শুনতে পারেন। কান ফাটান শিসের শব্দ। অবশ্য, তেমন ঘটনা বরফের রাজত্ব, মানে বায়ার্ড বা ওই ধরনের অঞ্চলেই ঘটা সম্ভব। হয়ত মাঝ সমুদ্রে পাবেন না। আর এক ধরনের শব্দ। ইনফ্রা সাউণ্ড। যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড়। কিন্তু কম্পাঙ্ক খুবই কম। ধরুন সেকেণ্ডে পনের ষোল। অর্থাৎ পনের ষোল হার্টজ। এ শব্দ মানসিক দিক দিয়ে আপনাদের পঙ্গু করেও দিতে পারে, ক্যাপ্টেন ?

চায়ের পেয়ালার শেষ বিন্দু চা চুমুক দেবার ভঙ্গীতে নিঃশেষ করে একটু থামলেন ক্যাপ্টেন আলবার্ট।

চা ! আই লাভ ইট্। আমার অত্যন্ত প্রিয় পানীয়। বিশেষ করে সে চা যদি দার্জিলিং-এর হয়। নিশ্চয় আমরা দার্জিলিং-এর চা পান করছি, ডঃ বাসু, তাই না ? দয়া করে আমার পেয়ালায় আর একটু চা ঢেলে দিন।

অবশ্যই দেব—বললাম আমি।

ক্যাপ্টেন আলবার্টের পেয়ালায় চা ঢাললাম।

ধন্যবাদ! বলেই ক্যাপ্টেন নিবিষ্ট মনে চা পানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করলেন।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি।

ক্যাপ্টেন শুরু করলেন—শরীর খারাপ, ইনফ্রা সাউণ্ড, মশায় অনেক কথাই ডঃ নাগুচি বলে গেলেন। শুনলাম। তবে গুরুত্ব দিইনি। পরদিন ডঃ নাগুচি চলে গেলেন। বলতে পারেন, সে সব মুহূর্তের মধ্যে আমি ভুলেই গেলাম। আর বলুন, এসব মনে রাখার কোন মানে আছে কি? আপনারা বিজ্ঞানীরা, মশায়, সত্যি বলতে কি আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনটাকে যেন দুঃসহ করে তোলার জন্যেই পণ করেছেন। সব কিছু আমরা সাদা চোখে দেখি, সাদা কানে শুনি। আর সাদা মাথায় বুঝি। কিন্তু আপনাদের জ্বালায় তার কি জো আছে? মাঝে মাঝে এমন এক একটা তত্ত্ব খাড়া করেন। তখন নিজের ওপর পুরো বিশ্বাসটাই লোপ পেয়ে যায়। তখন মনে হয় সাদা চোখে যা দেখছি, সাদা কানে যা শুনছি, তার সবটাই ভুল। আর এই যে মগজটা দেখছেন, মানে আমার খুলির মধ্যে তুলতুলে যে বস্তুটি এতদিন আমার চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তার সবটাই পণ্ডশ্রম। মশায়, কী বলব। তিরিশ বছর ধরে যে দুনিয়ার সারা দরিয়া চষে বেড়াল, তার কোথায় কী আছে সে সব কী না আমাকে এখন শিখতে হবে ডঃ নাগুচির কাছ থেকে? বলুন, ডঃ বাসু, আমি ঠিক বলছি কী না? মানে আপনাদের তত্ত্ব যাই বলুক, অভিজ্ঞতারও তো একটা দাম দিতে হয়?

আমি বললাম, সেটা অবশ্য ঠিকই। তবে ডঃ নাগুচির কথা যা আপনি বললেন, তার কিছু কিছু খবর আমিও রাখি, জাপানের একটি ফিজিক্যাল জার্নালে এসব সম্পর্কে কিছু কিছু তিনি লিখেওছেন। বলতে কী, ইদানীং ওই আপনারা যাকে বলেন সী সিকনেস, মানে সমুদ্রে জাহাজে থাকার সময় বমি করা, মানসিক

অবসাদ—কেউ কেউ বলছেন ডঃ নাগুচির তত্ত্ব নাকি ওই সব ব্যাপারের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে সমর্থ হবে। অবশ্য ইনফ্রা সাউণ্ডের উপর গবেষণা মাত্র বছর দশেক হল শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এই শব্দ মনের ওপর এবং শরীরের ওপর খারাপ প্রতিক্রিয়াই করে।

জানি না, মশায়। বললেন ক্যাপ্টেন আলবার্ট —জানেন তো গল্পটা? সেই নাপিতের গল্প?

না। আমার উত্তর।

জানেন না? তাহলে সেইটেই আগে শুনুন। এক গ্রামে এক নাপিত কাটা-ছেঁড়ার কারবার করে খুব নাম করেছিল। কার ফোঁড়া হয়েছে, কার ঠ্যাং-এ মাছ ধরতে গিয়ে কাঁটা ফুটেছে—রাজ্যের অস্ত্রোপচারের কাজ সেই করত। তখন তো এখনকার মত বড় বড় ডাক্তার ছিল না। কাটা-ছেঁড়ার কাজ হলেই লোকে সেই নাপিতের কাছে ছুটত। এই ভাবেই দিন কাটছিল তার। নাপিতের পসার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। এমন সময় সেই গ্রামের একটি ছেলে বড় ডাক্তার হয়ে এসে গ্রামেই চিকিৎসা করতে বসল। কিন্তু তার আর পসার হয় না। বিশেষ করে কাটা-ছেঁড়ার কেস হলেই সবাই ছোটে সেই নাপিতের কাছে।

তারপর? ক্যাপ্টেন আলবার্ট গল্প করতেও জানে।

হ্যাঁ, তারপর। ডাক্তার দেখে শুনে তো পসার করার কথা ছেড়েই দিল। একদিন এক বন্ধুকে বলল, এখানে ওই নাপিত যতদিন আছে, আমার আর কিছু হবে না, ভাই। বন্ধু বলল, দাঁড়াও নাপিতটাকে একটু শিক্ষিত করে দিই, তাহলেই সব হবে।

আচ্ছা? আমার কৌতূহল।

বন্ধুটি নাপিতকে গিয়ে বলল, বিদ্যে তোমার নেই বটে নাপিত পো, তবু বিলিতী পাশ করা ডাক্তারও তোমার কাছে হার মেনে গেল। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি একটু অ্যানাটমি জানতে, তাহলে ডাক্তার

আর দুদিনও সবুর করবে না। এ গ্রাম থেকে কেটে পড়বে। কথাটা শুনে নাপিত ভাবল—অ্যানাটমি। সে একটা কী না যেন। বলল শিখিয়ে দাও। দিতেই হবে। বন্ধুটি বলল, এই যে তুমি ফোঁড়া কাটা-ছেঁড়া কর, তার কিছু কিছু কেস খারাপও তো হয়? হয় কী না বল?

হয়, দু একটা কেস খারাপ তো হয়ই। কাটতে গিয়ে রোগী হয়ত মরেই যায়।

বন্ধু বলল, অ্যানাটমি জানলে সেটা আর হবে না। মানে শরীরের কোথায় কী কী ধরনের রক্ত বওয়া নল কী ভাবে ছড়িয়ে আছে—যদি এসব জানতে, তাহলে সেগুলি একটু বাঁচিয়ে কাটা-ছেঁড়া করা যায়। যায় কী না বল?

ন্যায্য কথা। নাপিত তো এবার খব খুশী।

বন্ধু বলল, তাহলে এস, শিখিয়ে দিই, শরীরের কোথায় কোন শিরা উপশিরা আছে, রগ আছে।

দুদিন খুব করে বন্ধুটি নাপিতকে অ্যানাটমি শেখাল। নাপিত ঘাড় নেড়ে জানাল, ব্যাপারটা সে খুব বুঝেছে।

ব্যাস নাপিত এবার শিক্ষিত।

তারপর? আমার প্রশ্ন।

তারপর ওষুধ ফলল। নাপিত এবার অ্যানাটমি শিখেছে কী না? এবার সে যে কেসই ধরে সব কেঁচে যায়। সাধারণ ফোঁড়া কাটছে তো ভাবছে অ্যানাটমির কথা। এই বুঝি একটি শিরা সে কেটে ফেলল। আর যেই ভাবা, সত্যি সত্যিই সে কেটে ফেলল। প্রচুর রক্তপাত হয়ে রোগী টেঁসে গেল। প্রায় সব রোগীই। এখন সে শিক্ষিত কী না? বলুন এর পর কে আর তার কাছে অস্ত্রোপচারের জন্যে আসবে? নাপিতকে দুদিনেই ঝাঁপ বন্ধ করতে হল। আর সেই ডাক্তারেরও পসার বাড়ল।

ক্যাপ্টেন আলবার্ট বললেন, ডঃ নাগুচির কথা শুনে আমারও সেই

অবস্থা হল। বলতে কী, ডঃ বাসু, ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ দিক দিয়ে কত বারই না জাহাজ বয়ে নিয়ে গেছি। কিন্তু এবার থেকে মুখে যতই সাহসের কথা বলি না কেন, মনে মনে কিন্তু বেশ খানিকটা দমেই রইলাম।

কেন? কোন দুর্ঘটনা তো ঘটে নি আর? আমার প্রশ্ন।

দুর্ঘটনা কী না, জানি না। কিন্তু সেই শিসের শব্দ সত্যিই আমি শুনেছি।

কী বলছেন আপনি? ডঃ নাগুচি তো অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলেছিলেন—?

মশায়, বিজ্ঞানীদের অনুমান কি সব সময় মিথ্যে হয়? এই যে মানুষ চাঁদে গেল, সেও তো পৃথিবীতে বসে তারা যে সব আঁক কষেছিল, তার ওপর নির্ভর করেই। বলুন, তাই কী না?

সে কথা অবশ্য ঠিক।

এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। এই বছর খানেক আগে। দক্ষিণ মেরুর বরফ ঢাকা অঞ্চলগুলি সম্পর্কে নিশ্চয় কিছু কিছু খবর আপনি রাখেন, ডঃ বাসু?

তেমন কিছু নয়। বললাম আমি।

আমারও যে প্রচুর অভিজ্ঞতা, তা বলব না। কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। বললাম না, এই বছর খানিক আগে? হ্যাঁ, আমার এই সাধের পেঙ্গুইনকে নিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের ভেড়ার পশম আর গম ফিরি করছিলাম। জরুরী সওদা। তাড়াতাড়ি যাতে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্যে ভারত মহাসাগরের ভেতর দিয়ে একটা সিধে পথ ধরে আমাদের এগোতে হল। অসুবিধে কিছু ছিল না। কারণ-ওপথ দিয়ে বহুবার আমি আনাগোনা করেছি। কিন্তু ফ্যাসাদ হল এবার। সেটাও ঠিক এমনি ডিসেম্বর মাস। এ সময়টায় দক্ষিণ অঞ্চলে কিছু ঝড় ঝাপটা হয়ই। তবে ভাবতে পারি নি এবারকার ঝাপটা শেষ পর্যন্ত আমাদের নাকানি চুবানি খাইয়ে

ছাড়বে। হ্যাঁ, সত্যিই আমরা ঝড়ে পড়লাম। আর ঝড় সামলাতে গিয়ে আমার সাধের পেঙ্গুইনকে বেপরোয়ার মত দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হল।

ক্যাপ্টেন আলবার্ট বলে যেতে লাগলেন। না, ঝড় আমাদের কিছু করতে পাবে নি। আমাদের হেনস্থা করল বড় বড় বরফের চাঁই। হা ভগবান! এ আমরা এলাম কোথায়? আমাদের চারপাশে বরফেব পাহাড ভেসে বেড়াচ্ছে। আবহাওয়াব তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি।

সেকেণ্ড অফিসার কারডিনি। ইটালিব মিলানে বাড়ি: একটু ভীতু ধরনের। এ সব দেখে তার তো মাথা খারাপ হওয়াব মত অবস্থা। সে বলল, বুঝতে পারছি, আমরা নরকেব দরজার কাছে হাজির হয়েছি।

একা কারডিনিই নয়। অনেকেরই একই অবস্থা। শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে সবাই চুপ করে রইল।

বিপদ কিছু হয়নি। মাত্র একটি রাত পেঙ্গুইনকে বড় এক বরফের পাহাড়ের পাশে নোঙর করে রেখে দিতে হয়েছিল। হিসেব নিকেশ করে মনে হয়েছিল, আমরা বায়ার্ডের কাছাকাছি অঞ্চলে রয়েছি। তার মানে, সেখান থেকে সোজা উত্তর দিকে রওনা হলেই উত্তমাশা অন্তরীপ বরাবর আসা যাবে। কম্পাস, ম্যাপ—এসব দেখে যখন যাত্রাপথ ঠিক করে নিচ্ছি, মনে পড়ে, রাত তখন প্রায় তিনটে। হঠাৎ! প্রচণ্ড এক বাজ পড়ার আওয়াজ। আর তার পরই কী বলব, ডঃ বাসু! শিস্! একটানা শিসের শব্দ। এক লয়ে বেজে চলেছে।

শুনেছি, সমুদ্রের কোন কোন জায়গায় অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যায়। আমি বললাম।

জানি। ক্যাপ্টেন আলবার্ট বললেন।—সমুদ্র এক ভিন্ন জগৎ। মাটির জগৎ ওপরে। সেখানে বন জঙ্গল, নানা রকম প্রাণী

—সবই আমরা দেখতে পাই, বলতে পারেন চোখের সামনে সবই যেন দৃশ্যমান। আর সমুদ্র। সেখানে ওপরে কিছু নেই। শুধু জল আর জল। শান্ত আবহাওয়ায় সমুদ্র যেন একটি বিরাট কাঁচের প্লেট। তার ওপরটা এত শান্ত, এত নির্জীব—প্রাণের কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু তার নিচে চলে যান। নিচে—ক্রমান্বয়ে নিচে। প্রাণের ব্যস্ততা সেখানেও বিরাজ করছে। কত প্রাণী, কত উদ্ভিদ। প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়মে কী প্রচণ্ড তাদের মধ্যে সহ-অবস্থানের ব্যবস্থা। হাঙরের দল, তিমি, স্যামনের ঝাঁক, রঙ-বেরঙী মাছের সারি—অথবা হাজার রকমের জলজ উদ্ভিদ! মাঝে মাঝে, বিশেষ করে রাতের দিকে শান্ত সেই সমুদ্রের বুকে কত রকমের সব অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়, কখনও দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। কখনও কান্নার। কখনও মনে হয় দূর থেকে কারা যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। হঠাৎ এ সব শব্দ শুনে—যাদের প্রথম অভিজ্ঞতা তাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। হ্যাঁ, সে সব শব্দ বহুবার শুনেছি। কেউ বলেন ওই শব্দ বাতাসের। কোন কোন জলজ প্রাণীও নাকি শব্দ করে মাঝে মাঝে। বিশেষ করে ডলফিনের ঝাঁক যখন এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলের দিকে ভেসে যায়—হল্লা করতে করতে চলে। কিন্তু, বিশ্বাস করুন ডঃ বাসু, সেই যে শিস্-এর শব্দ, তার যেন কোন তুলনা হয় না। আমি যে এমন একটা দামাল নাবিক, সেই শব্দ আমারও কলজেটায় যেন কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল!

কতক্ষণ ধরে চলল? আমার প্রশ্ন।

মিনিট তিনেক। তাতেই আমার মাল্লাদের প্রাণ যায় যায়। জন তিনেক তো অজ্ঞানই হয়ে গেল। একজনের মাথা খারাপ হওয়ার মত অবস্থা। ফিরে আসার পর তাকে নিয়ে আমাদের বেশ খানিকটা হুজ্জোত পোয়াতে হয়েছে।

ডঃ নাগুচি তাহলে যা অনুমান করেছিলেন, সেটা ঠিক। আমার মন্তব্য।

ঠিক মানে? পুরোপুরি ঠিক। আমাদের অভিজ্ঞতার কথা তাকে আমি জানিয়েও ছিলাম।

বিকেল গড়িয়ে কখন সন্ধ্যা নেমে এসেছিল, আমাদের কারোরই খেয়াল ছিল না। জরুরী অবস্থা। শহর কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট চলছে। ক্যাপ্টেন আলবার্ট এ শহরে নতুন। তাঁর পক্ষে এখন বাইরে থাকাটা ঠিক হবে না বলে আমিই তখনকার মত সভা ভঙ্গ করায় উদ্যোগী হলাম।

ঘড়ি দেখে বললাম, পাঁচটা বেজে গেছে। আপনার সঙ্গে বসে সময়টা সুন্দর ভাবে কেটে গেল।

আমারও খুব ভাল লাগল। বললেন ক্যাপ্টেন আলবার্ট।

ক'দিন আছেন কলকাতায়? আমার প্রশ্ন।

জানি না। সবই নির্ভর করছে বন্দরের কর্তৃপক্ষের ওপর। তবে মনে হয় দিন সাতেকের মধ্যেই জাহাজ ছাড়তে পারব। এ নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আজই কথাবার্তা হয়েছে। এখান থেকে যাব মোজাম্বিক। সেখান থেকে উত্তমাশা ঘুরে লিসবন। এই আর একটা ফ্যাসাদ হয়েছে, মশায়। সুয়েজ খালটা বন্ধ হয়ে থাকায়, দেখুন দেখি তিন দিনের পথ এখন তিন মাসের ধাক্কা।

উঠলাম আমরা।

একটা ট্যাকসি ডেকে কাপ্টেন আলবার্টকে তুলে দিলাম।

উষ্ণ করমর্দন এবং গভীর আন্তরিকতার মধ্যে দিয়ে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটল।

ক্যাপ্টেন আলবার্ট যাবার সময় বললেন, চলি। কে জানে হয়ত কোন দিন আবার আমরা পরস্পর মিলিত হব কি না। সাম ডে উই কুড মিট এগেইন।

নিশ্চয়। পৃথিবীটা অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন। ঘুরো

ফিরে কাছাকাছি আসতে আর কতক্ষণ? নিজেও খানিকটা ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলাম হয়ত।

ক্যাপ্টেন আলবার্ট বিদায় নিলেন।

আর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতে ফিরতে একটা কথাই শুধু ভাবছিলাম —অদ্ভুত লোক বটে ক্যাপ্টেন আলবার্ট। আর ভাবছিলাম সেই শিসের কথা।

কিন্তু তখনও কি ভেবেছিলাম, ক্যাপ্টেন আলবার্টের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে? আর সেই শব্দ নিজের কানেই আমি শুনতে পাব?

অলৌকিক কথাটার সত্যিকারের অর্থ আমার জানা নেই। কট্টর বাস্তববাদীরা বলবেন, প্রত্যেক ঘটনার পেছনেই একটি কারণ থাকে। ওসব অলৌকিক টলৌকিক বাজে কথা। একটু বিশ্লেষণ করলেই সব কিছুর অর্থ পাওয়া যায়।

এ সব যুক্তি তর্কের কথা। এ-সব মনে এলে আমি তালগোল পাকিয়ে ফেলি। নিজের দুর্বলতা ঢাকার ব্যাপারে যাঁরা দ্বিধা রাখেন না, আমার ধারণা, তাঁরাও তাই করেন। কারণ অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন, খুন হওয়া মানুষের শব পরীক্ষা করে হয়ত বলে দেওয়া যায় লোকটা কী ভাবে খুন হল। কিন্তু কেন খুন হল, তথাকথিত যুক্তি তর্কে সত্যিই কি সব সময় তার ব্যাখ্যা মেলে? প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কোন কোন ঘটনা বিচার করলে দেখা যাবে, বিশ্লেষণ হয়ত একটা দাঁড় করান যায়। কিন্তু তার অনেকটাই ধোঁয়াটে।

সেদিন ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পর এমন একটা ধোঁয়াটে ভাব কেমন যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলল মরিসাসে যাবার ব্যাপারে হঠাৎ বাধা পাওয়ার দরুন মনের মধ্যে যে অসন্তোষ ভাবটা জমে ছিল,

ক্যাপ্টেন আলবার্টের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সে ভাবটা অনেক কমে গেল।

মদনকে বললাম, হাল্কা ধরনের কিছু খাবার দাবার তৈরি করতে।

আমার একক পরিবারে এই ছেলেটির ওপরই আমাকে নির্ভর করতে হয় সব সময়। অত্যন্ত বিশ্বস্ত এই ছেলেটির ওপরই আমার সব কিছু ভার। অন্ততঃ কলকাতায় যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ তো বটেই।

মদন জানে, হাল্কা ধরনের খাবার মানেই, আমি রাত জেগে পড়াশুনা করব।

আমার কথা শুনে সে বলল, বেশি রাত জাগবেন না, বাবু। ডাক্তারের বারণ। আপনার পেসার বেড়েছে। বলেই সে কাজ করতে বেরিয়ে গেল।

মদন ব্লাড প্রেসারকে পেসার বলে।

ওর সব চাইতে বড় গুণ, ও কথা বলে কম। যেটুকু কাজের কথা, তার বেশি নয়। আর এর জন্যেই ওকে আমার ভাল লাগে।

রাত আটটার পর খেয়েদেয়ে গিয়ে বসলাম স্টাডিতে।

ক্যাপ্টেন আলবার্টের কথা শুনে দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম হয়ত।

দক্ষিণ মেরুর মানচিত্র বের করে যে যে অঞ্চলে এখন গবেষণা চালান হচ্ছে, সেই সব অঞ্চলের উপর চোখ বোলাতে লাগলাম।

ওই তো। দক্ষিণ আটলান্টিক থেকে আরও নিচে নেমে গেলে পড়বে স্কটিয়া সমুদ্র। মনে পড়ল ক্যাপ্টেন রবার্ট ফ্যালকন স্কটের কথা।

কী দুর্ভাগ্যই না ক্যাপ্টেন স্কটের! কুমেরু হয়ত তাঁকে পাগল করে দিয়েছিল। কুমেরুর বিভীষিকা অনুভব করে এর জন্যেই হয়ত তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'হে ভগবান! কি সাংঘাতিক জায়গা! গ্রেট গড্, হোয়াট এ হরিবল্ প্লেস।'

কুমেরুর হিমশীতল পরিবেশে ক্যাপ্টেন স্কটের মৃতদেহের পাশে তাঁর যে দিনলিপিটি পাওয়া যায়, তারই এক পৃষ্ঠায় এই কয়টি মর্মান্তিক শব্দ লিখে গেছেন তিনি। সেটা ১৯১২ সালের জানুআরি মাসের কথা। এর এক মাস আগেই ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১১ নরওয়ের অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন রোনাল্ড আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরু জয় করেন। এ জায়গাটি সম্পর্কে তাঁরও মন্তব্য—মৃত্যু, বিভীষিকা এবং বেঁচে থাকার এমন প্রতিকূল পরিবেশ বুঝি পৃথিবীতে আর একটি খুঁজে পাওয়া ভার।

কিন্তু সে সব পুরনো কথা। কুমেরুর বিভিন্ন অঞ্চলে এখন মানুষের পদচারণ দৈনন্দিন ঘটনা। বুলডজার, হেলিকপ্টার এবং নানান যন্ত্রের আর্তনাদে কুমেরু এখন মুখরিত।

হ্যাঁ স্কটিয়া সমুদ্রের নিচে ছিটে ফোঁটা দ্বীপগুলি পেরিয়ে নেমে গেলে ওই তো দেখা যায় একখণ্ড জমি। বেঁকে গিয়ে মিশেছে কুমেরু উপদ্বীপের সঙ্গে। তারও নিচে এলসওয়ার্থ ল্যাণ্ড। এলসওয়ার্থের বাঁ পাশে এঁকে বেঁকে ছড়িয়ে রয়েছে ট্রানস আটলান্টিক পর্বতমালা। আর ডান পাশে বায়ার্ড ল্যাণ্ড।

শিস্!

ক্যাপ্টেন আলবার্ট যে শিসের কথা বললেন, ডঃ নাগুচি এখানেই প্রথম তার সন্ধান পেয়েছিলেন। জাপানের একটি বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকায় তাঁর বিবরণও ছাপা হয়েছিল। সে বিবরণ আমি নিজেও পড়েছিলাম। ডঃ নাগুচি তাতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বেশি করে তুলে ধরেছিলেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তেমন একটা কিছু যোগান নি বললেই চলে। তাছাড়া ওই সময় অন্য কী একটা কাজে ব্যস্ত থাকায় সেটা নিয়ে তেমন মাথাও তখন ঘামাই নি।

এখন আবছা আবছা যেন মনে পড়ছে সব।

কবিত্ব আছে ডঃ নাগুচির। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—এই সময়ে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার চার

পাশে শুধু বরফ আর বরফ। বলতে পারেন আমার পায়ের নিচেও বরফের স্তূপ। আজ একটা পেঙ্গুইন-এর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। বরফের ফাঁকে একটা গর্তের ধারে সে ঘোরাঘুরি করছিল। অদ্ভুত চালচলন। কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। আমি কাছে গেলাম। কোন পরোয়াই করল না। বিস্কুট দিলাম। খেল। এমন কি আমার তাঁবুর কাছ বরাবর আমার পায়ে পায়ে হেঁটেও এল। কিন্তু জানি না কেন। মাঝ পথে হঠাৎ কেন যেন সে থমকে দাঁড়াল। তারপরেই প্রচণ্ড চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে গিয়ে বরফের ফাঁকে আত্মগোপন করল। আর ঠিক তখনই—সন্‌শন্‌ বাতাসের বেগ। মনে হল হঠাৎ যেন একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। হাওয়ার বেগ বাড়ল। কিছু পরে শিসের শব্দ। প্রথমে মৃদু। পরে—কী বলব আপনাদের, সেই শিস্‌ আমার মগজের মধ্যে সুঁচ ফোটাতে শুরু করল। আমি দৌড়ে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে কানের ওপর তুলোর প্যাড চাপিয়ে দিলাম। তবু কি শব্দ থামতে চায়? মিনিট তিনেক। তারপর কোন শব্দই আর শোনা যায় নি। শুধু একটি ব্যাপার দেখে অবাক হয়েছি। শিসের মত ওই শব্দ চলার সময় এ অঞ্চলের বাতাসে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ আধানের পরিমাণ বেড়ে যায়। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ সব ঘটনা তাঁবুর মধ্যে রাখা ইলেকট্রোস্কোপ এবং ম্যাগনেটোমিটারই নথিভুক্ত করেছিল।

ডঃ নাগুচি গল্পের মত এ সব লিখে গেছেন। শেষে বৈজ্ঞানিক হিসেবে এই ঘটনার একটি ব্যাখ্যাও খাড়া করেছেন।

তাঁর ব্যাখ্যাটি এখন আর মনে নেই। বর্ণনাটি মনে আছে। বিশেষ করে পেঙ্গুইনের বর্ণনা। জানি না কেন, একটা কথা ক্ষণিকের জন্যে তখন যেন মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেটা হল, পেঙ্গুইনটি অমন ভদ্রলোকের মত ডঃ নাগুচির সঙ্গে আসতে আসতে কেন চিৎকার করে উঠেছিল? এবং চিৎকার করে ওঠার পর অমন ছুটে পালিয়েই বা গেল্‌ কেন? ডঃ নাগুচি লিখেছেন, তারপরই সেই শিসের শব্দ।

পেঙ্গুইনের ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সেই শব্দের কোন সম্পর্ক নেই তো? বলতে পারেন হয়ত এটা আমার উদ্ভট কল্পনা। কোন রকম যুক্তি তর্কের তোয়াক্কা না রেখেই কেন এমন একটি ধারণা আমার মগজে হাজির হল, বলতে পারব না।

তবে শেষ পর্যন্ত আসল জায়গায় যে আমিও হাজির হয়েছি মাস তিন পরেই তা বুঝতে পারলাম। আর সেটা ঘটল বিশিষ্ট আবহাওয়া বিজ্ঞানী ডঃ ওয়েলচের হঠাৎ আমন্ত্রনে আর্জেন্টিনার তিয়েরা দেল ফুয়েগোয় পৌঁছানোর পর।

কোন ভূমিকা না করে ডঃ ওয়েলচ ব্যাপারটা আমার কাছে এই ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন—শুনুন ডঃ বাসু, যা কিছু ঝক্কি, সেটা গোড়ার দিকে। বলছি না, শুরুতেই আপনারা তাল সামলে উঠতে পারবেন। কারণ সেই শব্দ, আপনাদের কাছে শিসের মতই মনে হবে, কিন্তু তার সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া, বিশ্বাস করুন, প্রথম দিকে আমরাও প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আর কি। এদিক দিয়ে আপনাদের ভাগ্য ভাল। যে সব নতুন যন্ত্রপাতি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছে, আমার বিশ্বাস, হিসেব মত চললে বিপদের সম্ভাবনা কম। এসব কথা আপনাকেই বিশেষ করে বলছি, কারণ পুরো দলটিকে আপনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ব্যাপার কি জানেন, কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে নেতাদের সতর্ক থাকা উচিত। কিছু কিছু ব্যাপার নেতাদের গোপন করতে হয়। দলের পাঁচজন সে সব আগে থেকে জানলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে বলে।

দয়া করে শব্দটা আর একবার আমাকে শোনান, ডঃ ওয়েলচ। ডঃ ওয়েলচকে শেষ করতে না দিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

শুনুন। বললেন ডঃ ওয়েলচ। তারপর হাতের পাশের টেপ-রেকর্ডটি চালিয়ে দিলেন।

আর হ্যাঁ। পর মুহূর্তেই।

একটা প্রচণ্ড শিসের শব্দ! শব্দ? না, আর কিছু? বিশ্বাস

করুন, ঠিক ওই মুহূর্তে কেউ যদি আমার হৃদপিণ্ডের কম্পন মাপার চেষ্টা করতেন, নিশ্চয় তিনি আঁতকে উঠতেন।

শব্দ প্রতিরোধী ঘরের মধ্যে আমরা দুজন। ডঃ ওয়েলচ এবং আমি। উজ্জ্বল আলোয় ঘরটিকে যেন ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কারণ, ডঃ ওয়েলচ বললেন, আপনাদের পরিবেশ হঠাৎ এই ভাবে আলোয় ঝলসে উঠতে পারে। আর তখনই শুনবেন এই প্রাণঘাতী শিস্।

স্টেরিওফোনিক টেপ রেকর্ড তখন সরব।

অদ্ভুত এক শিস্। প্রথমে খাদ থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে সমস্ত ঘরের পরিবেশ এক অদ্ভুত আবেশে ভরিয়ে তুলল। তারপরেই চড়া পর্দা। সেই শব্দে মনে হল, পাঁজরার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল।

ডঃ ওয়েলচ আমার কাঁধের উপর হাত রাখলেন। একটু চাপও দিলেন সেই সঙ্গে। তারপর বাজনা থামিয়ে দিলেন।

ডঃ ওয়েলচ বললেন, কী কী আপনাদের করতে হবে, সে সব তো বলেছি। এবার শুভযাত্রা শুরু করুন।

তারিখটা মনে আছে। ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৮।

আর্জেন্টিনার তিয়েরা দেল ফুয়েগোয় বসে ডঃ ওয়েলচের সঙ্গে এই আমার শেষ নিভৃত আলাপ।

ডঃ ওয়েলচ বললেন, বয়েস হয়েছে, ডাক্তারেরও বারণ। নইলে এই অভিযানে আপনাদের সঙ্গে আমিও যেতাম, ডঃ বাসু। যাই হোক, ভয়ের কোন কারণ নেই। দক্ষিণ মেরুর অভিজ্ঞতা তো এটা আপনার নতুন নয়। তাছাড়া আপনাদের সমস্ত খবরাখবর প্রায় সবগুলি গবেষণা কেন্দ্রেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদলের আপনি নেতৃত্ব করছেন, এর জন্যে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

এই খাপছাড়া ভূমিকা পড়ে কেউ যদি মন্তব্য করেন, ভণিতা রেখে, আসল ব্যাপার কী ঘটেছিল, সেটাই বলুন তো, মশায়?

আমার উত্তর, পৃথিবীর পনেরটি দেশের বিজ্ঞানীর একটি দল নিয়ে আমি দক্ষিণ মেরুর বায়ার্ড অঞ্চলে যাচ্ছিলাম। মূল উদ্দেশ্য, ওই অঞ্চলের চৌম্বক ক্ষেত্রের রহস্য আবিষ্কার করা। না। শৌখিন পরিব্রাজক আমরা নই। আপনারা তো জানেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন এসব বেতার যোগাযোগ কী দারুণভাবে সম্প্রসারিত হতে চলেছে? কিন্তু মুস্কিল এই, মাঝে মাঝে অদ্ভুত রকমের চৌম্বক ঝড় এসে যে ভাবে বেতার সংকেত নষ্ট করে দেয়, যদি সত্যিই তেমন অসুবিধে কাটিয়ে উঠতে হয়, পৃথিবীর মেরুর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে আরও অনেক বেশি তথ্য আমাদের জানা দরকার। ডঃ ওয়েলচকে তো আপনারা চেনেন। মেরু অঞ্চলের নাড়ি নক্ষত্র তাঁর জানা। তাই যাত্রার আগে কী কী বিপদের সামনে আমরা পড়তে পারি সে ব্যাপারেই উপদেশ দিচ্ছিলেন তিনি। কী আমাদের করা উচিত, কী করা উচিত নয়, সে সব ব্যাপারেই সাবধান করে দিচ্ছিলেন। এই অভিযানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলাম আমি, ডঃ কাপুর, ডঃ বালসুন্দরম এবং সুমিত্রা মালহোত্রা। আর সেই শিস্ দলের একমাত্র মহিলা বিজ্ঞানী সুমিত্রাকে যে ওই ভাবে শেষ পর্যন্ত পাগল করে ছাড়বে, সে কথা কে আর আগে ভাবতে পেরেছিল, বলুন? বিশ্বাস করুন, সেই শিস্ শুনলে আপনাদেরও মাথা খারাপ হয়ে যেত। বলতে বাধা নেই, অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকেই আমরা বেঁচে ফিরে এসেছি। কী ভাবে?

আমাদের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি তা হলে শুনুন।

১৮ ডিসেম্বর, ১৯১৮। আর্জেন্টিনার তিয়েরো দেল ফুয়েগো বন্দর থেকে পনের জন বিজ্ঞানী, লোকলস্কর এবং অভিজ্ঞ নাবিক মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ জন যাত্রী যে জাহাজটিতে চড়ে বায়ার্ড-এর পথে রওনা হলাম, তার নাম পেঙ্গুইন। নামটা শুনেই চমকে উঠলাম। তাহলে

কি এটা সেই আলবার্টের জাহাজ ? শুনলাম, ছোটখাটো এই জাহাজটি এক সময় পণ্য বহনের কাজ করত। সম্প্রতি খোল-নোলচে পালটে এটিকে একটি গবেষক জাহাজে পরিণত করা হয়। ডিজেল চালিত এই জাহাজে শক্তিশালী রেডার ছিল, বরফ কেটে চলার মত সাজসরঞ্জাম। হেলিকপ্টার প্যাড এবং মেরু অঞ্চলের আবহাওয়া মাপার নানা রকম যন্ত্রপাতি সবই ছিল।

তিয়োরো দেল ফুয়েগো থেকে আমরা যাত্রা করলাম বিকেল পাঁচটায়। ওই দিন যাত্রার কিছু আগে হঠাৎ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

জাহাজ ঘাটায় 'শুভেচ্ছা' জানাতে এসেছিলেন প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ জেমস ই. ওয়েলচ।

কিন্তু জাহাজে পা দিতেই চমকে উঠতে হলো।

আরে, এই তো সেই ক্যাপ্টেন আলবার্টের জাহাজ ? কলকাতায় যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার ? তাহলে ক্যাপ্টেন আলবার্টও নিশ্চয় আছেন জাহাজে ?

আমাকে আর বেশিক্ষণ ভাবতে হয় নি। সিঁড়ি বরাবর উপরের দিকে উঠতেই দেখি, হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম—ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন আলবার্ট স্বয়ং।

ওলা, ওলা! ডঃ বাসু! ক্যাপ্টেন আলবার্ট আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেখেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

পুরানো সেই মুখটি আবার দেখতে পেয়ে বড় আনন্দিত হলাম। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাঁকে আবেগে জড়িয়ে ধরলাম। আবার আমাকে দেখতে পেয়ে তিনিও যেন চমকে উঠেছিলেন। আনন্দিতও।

কী আশ্চর্য! যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। বললেন তিনি।

আমারও ওই একই অবস্থা। আমার উত্তর।

ডঃ ওয়েলচ বললেন, ক্যাপ্টেনকে তুমি চেনো নাকি, ডঃ বাসু ?

কী ভাবে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, বললাম।

অবাক কাণ্ড ! ডঃ ওয়েলচও বেশ খুশি হলেন আমার কথা শুনে। বললেন, নতুন দায়িত্ব নিয়ে চলেছি এবার।

পরিকল্পনা মত আমরা সোজা দক্ষিণ দিক বরাবর এগিয়ে চললাম। এবং দু দিনের মধ্যেই কেপ হর্ণ অতিক্রম করে ড্রেক প্যাসেজের মধ্য দিয়ে গিয়ে পড়লাম কুমেরু সাগরে। অতঃপর পামার স্টেশন ছাড়িয়ে প্রথমে বেলিংসাউসেন সাগর, তারপর আমুণ্ডসেন সাগর হয়ে প্রায় দিন দশের মধ্যে পেঙ্গুইন হাজির হল বায়ার্ড ল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের প্রায় মাইল দশেকের মধ্যে। ঠিক কোথায় আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। কারণ এসব অঞ্চলের ঠিকানা কে আবার জোগাড় করতে পেরেছে, বলুন ?

যাই হোক বায়ার্ড-এ পৌছনোর পর আমাদের প্রথম কাজ ছিল আশপাশের পথঘাটগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে নেওয়া। মেরু অঞ্চলে এটাই বুঝি সব চাইতে কঠিন কাজ। কারণ সত্যিকারের স্থলভাগ বলতে যা বোঝায় সে সব অনেক আগেই আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। পেঙ্গুইন এখন যেখানটায় দাঁড়িয়ে তার আশপাশে শুধু বরফ আর বরফ, এক একটা বরফের চাঁই সোজা পাচিলের মত দাঁড়িয়ে। কোনটা বা খাড়া আকাশের দিকে উঠে গেছে। কত উঁচুতে জানি না।

তিয়েরো দেল ফুয়েগো থেকে রওনা হওয়ার পর আমার বেশির ভাগ সময়ই কাটত আলবার্টের কেবিনে। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের বুকে ওঁর দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শুনে। এ কয়দিন দারুণ উত্তেজনাতেই কাটিয়েছিলাম। আমি নিজে বিজ্ঞানী দলের নেতা বলে আলবার্ট আমাকে রসিকতা করে ডাকত 'বস' এই নামে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম।

৩০শে ডিসেম্বর বায়ার্ডে পৌছে দেখি, আবহাওয়া যেন এক নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

আলবার্ট বললেন, মনে হচ্ছে রাক্ষসটা জেগেছে।

তার মানে? অজ্ঞাত আশঙ্কায় সত্যিই আমার গলা যেন কেঁপে উঠল। বস, আপনার সাঙ্যাৎদের একটু সাবধানে থাকতে বলুন। বললেন আলবার্ট। —না ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে এখন ঝড় হচ্ছে, দেখছেন তো? আমাদের জাহাজটায় অবশ্য শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ভাল ব্যবস্থাই রয়েছে। তবু, পাকামী করে আপনার সাঙ্যাৎদের মধ্যে অতি উৎসাহী কেউ যেন ডেকের ওপর ঘোরার চেষ্টা না করে। আমার মনে হচ্ছে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তাপমাত্রা আরও কমবে। স্নো বাইট হলে কিন্তু রক্ষে নেই। জীবনের বেশ কিছু দিন তো উত্তর মেরুতেই কাটিয়েছি, বস। দক্ষিণ মেরুতেও বছর দশেক। আমি হলফ করে বলে দিতে পারি, এই তাপমাত্রা কমার পর আবার কী হতে পারে। সে আরও ভয়ঙ্কর, আরও সাংঘাতিক, বস্।

আলবার্টের শেষের মন্তব্যে চমকে উঠলাম আমি। কী বলতে চান তিনি?

প্রশ্নটা তখনই করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

শিস্!

বন্ধ কেবিনের মধ্যেও সেই শিসের শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল।

শিস্? হ্যাঁ সত্যিই সাংঘাতিক তার শব্দ। নির্জন সেই পরিবেশে একমাত্র জনতা পেঙ্গুইন এর গুটিকয় যাত্রী। মসৃণ বরফ পাহাড়ের গায়ে গায়ে বারবার প্রতিফলিত হয়ে সেই শিস্ মুহূর্তে চারপাশটা এক অতিপ্রাকৃতিক আবেশে ঢেকে ফেলল।

ব্যাপার কি? তাহলে ডঃ ওয়েলচ কি এই 'শিস্'-এর কথাই বলেছিলেন? আমার প্রশ্ন।

দাঁড়ান, ডঃ বাসু। আলবার্টের কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর। আড্ডাবাজ আলবার্ট এখন পেঙ্গুইনের কড়া ক্যাপ্টেন।

বলুন? আমার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

দয়া করে এই টেলিফোনটার দিকে তাড়াতাড়ি একবার আসুন তো? বলেই আলবার্ট প্রায় ধাক্কা মেরেই আমাকে নিয়ে এলেন টেলিফোনের সামনে।

এবার আমায় কী করতে হবে? আমার জিজ্ঞাসা।

মনে হল আলবার্ট মুহূর্তে মত পালটালেন। তারপর নিজেই টেলিফোন রিসিভার তুলে নিয়ে কতকটা আদেশের সুরেই বলতে লাগলেন তিনি—প্রিয় মহাশয়রা, আপনারা সবাই একটা শিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। পাচ্ছেন তো? আমি ক্যাপ্টেন আলবার্ট বলছি। দয়া করে যে যাঁর কেবিনে রয়েছেন সেখান থেকে বাইরে বেরুবেন না। আর হ্যাঁ, আপনাদের কেবিনে লেখার ডেস্কের সামনে হুটো করে ঠুসি ঝোলান রয়েছে। ঠুসি হুটি যে যাঁর কানে পরে নিন।

হ্যাঁ। এটুকুই আদেশ। আদেশ জানিয়ে দেবার পর আলবার্ট আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডঃ বাসু, এই নিন। আপনিও হুটি ঠুসি কানে গুঁজে দিন। বলেই আলবার্ট নিজেই যেন ঠুসি হুটি জবরদস্তি আমার কানে গুঁজে দিলেন।

বলতে কি, মনে হল আমি পুরোপুরি কালা হয়ে গেছি।

আলবার্ট স্থির হয়ে শব্দ মাপার একটি যন্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অবশ্য তার আগে নিজের কানেও ঠুসি পরে নিলেন তিনি এবং জাহাজের সমস্ত মাল্লা এবং অফিসারদেরও তাই করতে বললেন।

যে যন্ত্রটার সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন সেটি দেখতে একটা ক্ষুদে বাকসের মত। বাকসের ওপর ছোট্ট একটি চোঙ। চোঙটা দেখতে সেকেলে গ্রামোফোনের চোঙের মত।

আলবার্ট চোঙটিকে এদিক সেদিক ঘোরাতে লাগলেন। তারপর এক জায়গায় স্থির করে রেখে বাক্সের সামনেকার একটি ধূসর কাঁচের পর্দার উপর কী যেন দেখতে লাগলেন।

আমি ততক্ষণ তাঁর পেছনে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার সামনে সেই ক্ষুদে বাকস। বাকসের ওপর পর্দা। পর্দার ওপর নীল রঙের উজ্জ্বল একটি রেখা এঁকে বেঁকে লাফালাফি করছে।

বাকসটির পাশে ছোট্ট একটি যন্ত্রগণক।

আলবার্ট কিছুক্ষণ ওই পর্দার ওপর চেয়ে থাকার পর যন্ত্রগণকের একটি বোতামে চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে থেকে ফিতের মত একখণ্ড কাগজ বেরিয়ে এল।

কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে আলবার্ট কী দেখলেন। প্রথমে তাঁকে বেশ গম্ভীর, কিছুটা শঙ্কিতও মনে হয়েছিল যেন। কিন্তু কাগজটির উপর সাংকেতিক লেখা পরীক্ষা করে বললেন, না। তেমন কিছু ভয়ের নয়। ডঃ বাসু, আপনিও দেখতে পারেন।

বলেই আলবার্ট কাগজের টুকরোটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

সেটি হাতে নিয়ে দেখলাম একবার। কিছুই বুঝলাম না।

নিজের অজ্ঞতার কথা বলতেই আলবার্ট জানালেন, মাফ করবেন, ডঃ বাসু। আমরই ভুল হয়েছে। এসব যন্ত্রের কথা আপনিই বা জানবেন কী করে? একটু আগেই বলছিলাম না আপনাকে, রাক্ষসটা জেগেছে! শিস্ এখন থেমে গেছে। তবে মনে হচ্ছে, যে দিকে আপনারা যাওয়ার মতলব করছেন তার সাক্ষাত সেখানে পাবেন। যে শব্দটা এখন শুনলেন না, তার মাত্রা কত জানেন? অন্ততঃ আঠারো হাজার হার্ৎজ। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। বিপদ এই, মাঝে মাঝে এই শব্দের প্রাবল্য এত বেশি বেড়ে যায় যে, যে কেউ তার মধ্যে পড়লে পাগলও হয়ে যেতে পারে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা তাহলে বোঝা গেল।

আলবার্টের কথার ফাঁকে বললাম, তাহলে এই শব্দের কথাই কি ডঃ ওয়েলচ আমাকে বলেছিলেন?

বলেছিলেন নাকি? আলবার্টের কণ্ঠে বিস্ময়।

শুধু বলেন নি। টেপ রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছেনও।

ও। তাই বলুন। টেপ রেকর্ডে শুনেছেন তাহলে। বলছি কি

ডঃ বাসু, টেপ রেকর্ড শুনে এসব ব্যাপারে কিছুই আন্দাজ করতে পারবেন না। আসল বাস্তবটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

সে কথাও ডঃ ওয়েলচ বলেছিলেন। তবে এ সব ব্যাপার আমার দলের আর কাউকে জানান হয় নি। ডঃ ওয়েলচ মনে করেন, কোন ব্যাপারে যদি ভয়ের কিছু থাকে আগে থেকে তা নিয়ে বেশি আলোচনা না করাই ভাল। যাঁরা আমার সঙ্গে রয়েছেন তাঁরা সবাই তো বিজ্ঞানী। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়ে কে কী ভাবে প্রতিক্রিয়া করে দেখা যাক না। যদি কেউ সত্যিই ভয় পায়, অথবা কারোর যদি মন মেজাজ বিগড়োয় সে না হয় তখন বোঝা যাবে।

মতলবটা মন্দ নয়। মানে বলতে চান ভয়ের কথা আগে থেকে বেশি বলাবলি করলে লোকে আগে থেকেই আধমড়া হয়ে পড়ে, এই তো? বললেন আলবার্ট।

কিন্তু রাক্ষস বলতে কাকে আপনি বোঝাচ্ছেন, আলবার্ট? আলবার্টকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

কেন, আপনি কি জানেন না? যদি জানা না থাকে, তবে ডঃ ওয়েলচের মত আমিও বলি, "ভয়ের কথা আগে থেকে জেনে লাভ কী"? অভিজ্ঞতাটা নিজেরাই অর্জন করার চেষ্টা করুন?

উঃ! সাংঘাতিক লোক বটে আলবার্ট। কথায় ওঁর সঙ্গে কারোর পক্ষে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

যাক। মিনিট দশের মধ্যে সেই শব্দ পুরোপুরি থেমে গেল। সতীর্থ বিজ্ঞানীদের আমরা কান থেকে ঠুসি খুলে ফেলতে বললাম।

সেদিনটা ওই ভাবে গেল। কিছুটা আশঙ্কায়, কিছুটা অজানা রহস্যের স্পর্শে। রাতের দিকে বিজ্ঞানীদের নিয়ে ছোটখাটো একটা কনফারেন্স বসালাম। এর পর আমাদের কী করণীয় সে সব নিয়ে বিশদ আলোচনা করলাম আমরা। সেই সঙ্গে কার ওপর কী কী দায়িত্ব পড়বে প্রত্যেককে ভাল করে আবার আমি বুঝিয়ে দিলাম।

আসল ব্যাপার এই, আমাদের মূল প্রোগ্রামটা ছিল এক মাসের। ঠিক হল, আলবার্ট পেঙ্গুইনকে এখানেই নোঙর করে অবস্থান করবেন। খাবার দাবারের মূল ভাঁড়ার জাহাজেই থাকবে। মূল গবেষণা কেন্দ্র থেকে বেতার সংকেতের সাহায্যে আমরা যোগাযোগ রেখে চলব। জাহাজের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রগণক এসবের দায়িত্ব রইল ফরাসী বিজ্ঞানী ডঃ স্যালাম্বিয়ের ওপর। তাঁকে সাহায্য করবেন রুশ বিজ্ঞানী পিতর পোপোভিচ, ডঃ বালসুন্দরম এবং মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ হ্যারিসন। ওঁদের সঙ্গে আরও তিনজন বিজ্ঞানী কাজ করবেন।

আমুণ্ডসেন সাগরের যে খাঁড়িটির মধ্যে পেঙ্গুইন নোঙর করেছিল সেখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থলের দূরত্ব প্রায় দুশো কিলোমিটার। মাঝে কয়েকটি খাড়াই পাহাড়। এবং এ রাজত্ব পুরোপুরি বরফের।

পরদিন ১ জানুআরি। ভাবুন, নববর্ষের এই শুভদিনটিতে মূল ভূখণ্ডের সবাই যখন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে, তখন আমরা নয় জন অভিযাত্রী হাজার হাজার মাইল দূরে এক বরফের রাজত্বের মধ্যে পড়ে মানব সমাজের প্রায় সব রকম সামাজিকতা ভুলতেই বসেছিলাম, যদি না আলবার্ট সে কথা আমাদের জানিয়ে দিতেন।

১ জানুআরি ঠিক রাত ১২টার সময় পেঙ্গুইনের একটি সাজান হল ঘরে আমরা সংক্ষেপে নববর্ষ উৎসব পালন করলাম। আলবার্ট নিয়মমাফিক তোপ ফাটিয়ে নতুন বৎসরকে স্বাগত জানালেন। জাহাজের কয়েকজন অফিসার এবং অন্যান্যরা মিলে খানিকটা নাচ গানও করলেন। ছোটখাটো একটা বক্তৃতাও দিয়ে বসলেন আলবার্ট। বললেন, শুনুন, মশাইরা। আমি মুখ্খু মানুষ। নরওয়ের জেলে পরিবারের ছেলে। তাই ছোট বয়েসে জীবন কেটেছে সমুদ্রের মাছের সঙ্গে কোলাকুলি করে। পরে সারা দুনিয়ার যত সব দরিয়া সব চষে বেড়িয়েছি। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এই যে পেঙ্গুইন দেখছেন, আমার সাধের এই জাহাজ পেঙ্গুইন মশায়, কী বলব শত্রুপক্ষ এর গায়ে টরপেডো তাক্ করেছিল। ঘায়েলও করেছিল কিছুটা। তবে বুজিয়ে

দিতে পারে নি। তখন আমি মালাক্কার দরিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেদিনও নববর্ষ। ভাবুন আপনারা। জাহাজের ফুটো দিয়ে জল ঢুকছে। আমি মাল্লাদের বললাম, পাম্প চালিয়ে যতটা পার জল বের করে দাও। ওরা তাই করতে লাগল। পাইলটকে বললাম, জাহাজকে নিয়ে এখন এখান থেকে কেটে পড়ার চেষ্টা কর। সে তাই করতে লাগল। আর আমি জন দশেক ক্রু-কে সঙ্গে করে নববর্ষের পানীয় বিতরণ করে বেড়াতে লাগলাম মাঝি-মাল্লাদের কাছে। তাদের বললাম, উৎসবটা ভালভাবে পালন করি, ভাই। কারণ উৎসবের মধ্যেই মানুষ নিজেকে অনুভব করতে পারে। আর সব তো ঝুটা।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার গিব্‌সন এক গেলাস পানীয় হাতে। দেখছিলাম বেশ গম্ভীর হয়ে যেন কত মনোযোগের সঙ্গে তিনি ক্যাপ্টেনের বক্তৃতা শুনছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এমন বক্তৃতায় আমরা সবাই বেশ খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ক্যাপ্টেনের বক্তৃতার ফাঁকে গিব্‌সন আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, সবুর করুন, ক্যাপ্টেন এর পরেই কেঁদে ফেলবে।

মানে? আমার প্রশ্ন।

মানে আর কি? নববর্ষ বুঝতে পাচ্ছেন না? সন্ধ্যে থেকেই তো টেনে রয়েছেন। আপনি কি মনে করেন, উনি সজ্ঞানে আছেন?

কিন্তু কথাগুলি বড় ভাল লাগল।

ভাল লাগবে না? মানুষটা যে ঘা খাওয়া। জীবনের সবটাই সমুদ্রের বুকে যন্ত্র নিয়ে কাটাতে কাটাতে কত অভিজ্ঞতাই না হয়েছে ওঁর। জাহাজ ঝড়ে পড়েছে। কখনও বরফে আটকে গেছে। দিনের পর দিন খাবারের অভাবে ধুঁকেছে জাহাজের সমস্ত মানুষ। মানুষ তখন কি আর মানুষ থাকে? অমানুষ হয়ে যায় সব। কেউ যদি তখন কারোর ঘাড়ের ওপর পড়ে কাউকে খুন করে, বলব সেটাই স্বাভাবিক ঘটনা। এই যে বরফের রাজত্বে আপনারা অভিযানে

চলেছেন, তেমন বিপদ সেখানে আপনাদেরও আসতে পারে। তখন, ওই যে মানবিকতা বলে একটা কথা বলি না, সে সব আর মনে থাকে না।

দেখুন ব্যাপারখানা। এক মাতালের ছেড়ে এবার আর এক মাতালের বক্তৃতা শুরু হল। না, লোকটা একটা কথা কিন্তু ঠিকই বলেছে। বড় বড় অভিযানে সত্যিই মাঝে মাঝে দারুণ বিপদ আসে। তখন সত্যিই মানবিকতা কথাটা কারোর মনে থাকে না।

মিনিট ছুয়েকের মধ্যেই লোকটির কথা ফলে গেল। আলবার্ট ডুকরে কেঁদে উঠলেন কী বলতে বলতে যেন। এ এক দারুণ উত্তেজনা। আনন্দ তো নিশ্চয়।

আমাদের দলের একমাত্র মহিলা বিজ্ঞানী সুমিত্রা মালহোত্রা। বছর বত্রিশ বয়স। কণা-পদার্থবিজ্ঞানে এই বয়সেই সে যথেষ্ট নাম করে ফেলেছে। গবেষণা আমার কাছেই করেছিল। মনে আছে হয়ত আপনাদের, গত বছর উতকামণ্ডের রেডিও-টেলিস্কোপে আমার সঙ্গে কাজ করার সময় মহাজাগতিক একটি ঘটনার মধ্যে আমরা ছুজনেই বেশ জড়িয়ে পড়েছিলাম। ওর ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগে। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতা ওর অপরিসীম। বিজ্ঞানী হিসেবেও প্রতিশ্রুতিসম্পন্না। কিন্তু বেচারা একা পড়ে গেছে এই ভিড়ে।

অসুবিধে কিছু হচ্ছে না তো? একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম সুমিত্রাকে।

না, ভালই তো লাগছে। ওর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

উৎসব শেষ হল গভীর রাতে।

পরদিন। ২ জানুআরি। পেঙ্গুইনের বিস্তৃত ডেকের ওপর থেকে ছ'খানা হেলিকপ্টার গর্জন করতে করতে যাত্রা শুরু করল। আমাদের

যাত্রা। আমরা অবশিষ্ট নয় জন বিজ্ঞানী। জন চার কুশলী এবং জন পাঁচ সহকারী। সঙ্গে তাঁবু, যন্ত্রপাতি এবং বরফের উপর দিয়ে চলার মত বিশেষ ধরণের দু'টি ল্যাণ্ডরোভার। শূন্যের চেয়েও অনেক নিচের তাপমাত্রায় যাতে ওই গাড়ি চলতে পারে, অতিরিক্ত শীতে যাতে তার ধাতব যন্ত্রপাতি নষ্ট না হয়ে যায়, জ্বালানি ঠিক মত কাজ করে, সেদিকে নজর রেখেই তাদের তৈরি করা হয়েছিল। জানেনই তো, সাধারণ ধাতু শূন্যের তাপমাত্রায় ভঙ্গুর হয়ে যায়। দুটি হেলিকপ্টার বোঝাই করে খাবারদাবার এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে, যদি দরকার হয়, অক্সিজেন সিলিণ্ডার এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম নেওয়া হয়েছিল।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগল গবেষণা কেন্দ্রে পৌঁছতে। হেলিকপ্টারগুলি যেখানে এসে থামল সেখানে বরফ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। তবে উঁচু নিচু খাড়াই নেই। মালভূমির মত বিস্তৃত পরিবেশ। কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, কে জানে?

পূর্ব নির্দেশমত সবাই আমরা হেলিকপ্টার থেকে নামলাম। অসুবিধে তেমন কিছু বোধ করার কথা নয়। বরফ থেকে ঠিকরে আসা উজ্জ্বল আলো যাতে হঠাৎ চোখের কোন ক্ষতি না করতে পারে তার জন্যে বিশেষ ধরনের গগল্‌স সবার চোখে আঁটা। সবার পরনেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পোশাক। ব্যাটারির সাহায্যে পোশাকের ভেতর শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা ছিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাতটা তাঁবু বসান হল। আমার তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা করা হল আরও তিন জন বিজ্ঞানীর। ইতালীর ডঃ কার্ডিনি, ভারতের ডঃ কাপুর এবং পশ্চিম জার্মানির ডঃ গেরহার্ট। পাশের ছোট্ট একটা তাঁবুতে সুমিত্রার ব্যবস্থা। অন্যান্য তাঁবুতে অন্যান্যরা। এবং এ সব হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে মধ্যাহ্ন ভোজন। আর তারপরই চারদিকে গবেষণার জন্যে কয়েকটি যন্ত্র স্থাপন করার কাজ শেষ হল।

সেদিনটা নিজেদের গুছিয়েই নিতেই চলে গেল। পরদিন অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় আসল কাজ। বলতে পারেন রীতিমত অভিযান একটা।

আগেই বলেছি, মোট নয় জন এসেছি এই গবেষণা কেন্দ্রে। আমাদের পায়ের নিচে বরফ। আশপাশে বরফ। হ্যাঁ, বরফই শুধু, সেখানে এতটুকু প্রাণের স্পর্শ নেই। আবহাওয়া এত শুকনো, যার সঙ্গে একমাত্র সাহারার কোন কোন অঞ্চলের তুলনা চলে। আমুণ্ডসেন-স্কট স্টেশন থেকে ২৮০৪ মিটার উঁচু বরফের মালভূমি ক্রমে ঢালু হয়ে এদিকটায় নেমে এসেছে গড়ানের মত। সারা অঞ্চল জুড়ে সব সময় বয়ে চলেছে ঝড়ের তাণ্ডব। সেই সঙ্গে আবহাওয়ার তাপমাত্রা শূন্যের প্রায় ৮০ ডিগ্রি নিচে।

চারদিকে মেরুপ্রভা। এ সময়টার এ অঞ্চলে দিন রাত্রের কোন সীমা নেই। গ্রীনিচের সময় ধরে তাই আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। ঘুমনো, ঘুম থেকে জাগা, কতক্ষণ কাজ করা হবে, সমস্ত কিছু একই সময়ের তালে চলছিল।

না, গোড়ায় বাধা তেমন কিছু ঘটেনি। তবে বুঝতেই তো পারছেন প্রতিকূল পরিবেশে কাজকর্ম করতে গেলে বড় রকমের ঝক্কি খানিকটা থাকেই?

বলতে কি, সে সব কথা আমরা তেমন একটা ভাবিনি। কারণ আমাদের মন পড়ে ছিল মেরুর চৌম্বক ঝড়ের ওপর। আকাশ থেকে নেমে আসা নানা রকম রশ্মি এবং বিশেষ করে মহাজাগতিক কণার উপর মূল গবেষণার বিবরণ দিয়ে আপনাদের আমি বিরক্ত করতে চাইনে। কারণ আমি তো আর বিজ্ঞানের কোন থিসিস লিখতে বসিনি? আসলে যে ঘটনা বলতে চেয়েছি, তার পটভূমিকা হিসেবেই এত সব কথা বললাম। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, বিজ্ঞানীরা কখনও কখনও কী দারুণ ঝক্কি নিয়ে কাজ করেন সে সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা আভাস দেওয়া। সংক্ষেপে বলে রাখি, সব

কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। এবং হয়ত চলতও, যদি না ৮ই জানুআরি হঠাৎ সেই ঘটনাটা না ঘটত।

৮ই জানুআরি। সারাদিন পরিশ্রম করার পর সকলেই আমরা যে যার তাঁবুতে শোয়ার আয়োজন করছি। এ কয়দিন মূল্যবান যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলি বেতার সঙ্কেতে 'পেঙ্গুইন'-এ পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে সেগুলি পাঠান হবে হর্ণ অন্তরীপের মানমন্দিরে। তারপর কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ক্যালিফোর্নিয়ায়।

একটা ব্যাপার এ কয়দিনে লক্ষ করেছি। অনেকেই হঠাৎ কেমন যেন মূক হয়ে গেছে। নীরবতা? মেরুঅঞ্চলের একটানা একই ধরনের পরিবেশে, বৈচিত্র্যহীন আবহাওয়ায় সবাই কি মানসিক অবসাদে ভুগতে বসল? কাজ করছে সবাই, যন্ত্রের মত। আজ দুপুরে আমাদের আশেপাশে মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ হয়ে গেল। ঝড়ের বেগও বেড়েছে কিছুটা। ডঃ কাপুর বললেন, চৌম্বক ঝড়ের সম্ভাবনা আছে।

হ্যাঁ, শোবার আগে আমার তাঁবুতেই আমি কথা বলছিলাম ডঃ কাপুর এবং পোল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ডঃ অ্যাণ্টোনিয়োভিচের সঙ্গে।

কথার ফাঁকে বললাম, তাহলে রাক্ষসটা জাগছে।

রাক্ষস কথাটা আমার নয়, ক্যাপ্টেন আলবার্টের। আলবার্ট মেরুর পরিবেশকে বলেন রাক্ষস। যখন সেখানে ঝড় দেখা দেয়, তখন তিনি বলেন রাক্ষসটা জাগছে। তাঁর কাছ থেকেই কথাটা আমার কাছে যেন একটা মুদ্রা দোষ হয়ে দাঁড়াল।

ডঃ কাপুর বললেন, তাই তো মনে হয়। চৌম্বক ঝড় দারুণভাবে বাড়বে বলেই মনে হয়।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়োভিচ্ বললেন, এসব জায়গার মতিগতি বোঝাই দায়। ডঃ বাসু, যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের মাত্রা আরও বাড়ে, আমি হলফ

করে বলছি, আমরা অবশ্যই ডুবব। কারণ এখানকার রেডিও নয়েজ তাতে করে দারুণভাবে বাড়তে থাকবে। ফলে যে সব রেডিও উইনডোর আমরা খোঁজ করছি, তাদের দেখা মেলাই ভার হবে।

জানি। বললাম আমি। কতকটা আত্মগতভাবেই যেন বললাম।

সুমিত্রা বলল, মনে হচ্ছে সূর্যে হঠাৎ কোথাও ঝড় উঠেছে। সূর্যের ঝড় কখন ওঠে সে সব তো আগে জানা যায় না।

আমি সুমিত্রার কথায় কোন মন্তব্য করলাম না। বরং আত্মগত-ভাবে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

মিনিট দুই বিরতি।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন ডঃ হিহং। তরুণ চৌম্বক বিজ্ঞানী ডঃ হিহং স্পেনের লোক। তাঁর ওপর ভার ছিল ম্যাগনেটোমিটার কখন কি রিডিং দেয় সেটা খুঁটিয়ে লক্ষ করার।

কী ব্যাপার?

আমাদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা।

আজ রাতেই প্রচণ্ড ঝড় নামছে। চৌম্বক ঝড়। বললেন ডঃ হিহং। তিনি বেশ কিছুটা শঙ্কিত যেন।

আর কিছু? আমার প্রশ্ন।

মনে হচ্ছে আয়ণিত গ্যাসেরও মাত্রা বাড়বে একই সঙ্গে।

আমি জানি। আমার উত্তর।

তার অর্থ কি কিছু বুঝতে পারছেন, ডঃ বাসু?

বুঝি। আগে বলুন তো, ইলেকট্রোস্কোপের রিডিং কী রকম? আমার পালটা প্রশ্ন।

হ্যাঁ। চার্জ বাড়ছে। বললেন ডঃ হিহং।

আমরা তাহলে সত্যিই বিপদের সামনে উপস্থিত বললাম আমি।

কারণ আগে থেকেই জানা ছিল এই পরিবেশে, মেরুর বরফ থেকে বেরিয়ে আসবে প্রচুর বৈদ্যুতিক আধান। এ তো আপনারাও

জানেন। বরফ যখন গলে তখনও যেমন, আবার বরফের কেলাসের দুই প্রান্তে যখন তাপমাত্রার পার্থক্য থাকে তখনও সেখানে বিদ্যুৎ আধানের সৃষ্টি হয়। আর সেখানটায় আমরা বসে তার কিছু দূরে সমুদ্রের কিছু অংশ ঢুকে পড়েছে। বরফের যে অংশ সেই সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সেখানকার তাপমাত্রা খানিকটা বেশি হবেই। অতএব বিদ্যুৎ আধান জমতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক তাঁবুতে খবর পাঠান হল। খবর বয়ে নিয়ে গেলেন ডঃ হিহং। সবাইকে আমার ঘরে জমা হবার অনুরোধ জানালাম। শুধু বিজ্ঞানী নয়। আমাদের সাহায্যের জন্যে যে সব কর্মীরা ছিলেন তাঁদেরও।

আমার তাঁবুতে তাঁরা উপস্থিত হলে বললাম, দয়া করে আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁবু ছেড়ে আপনারা বাইরে বেরুবেন না। এতে করে বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবং এ ছাড়াও—!

কথাটা শেষ করতে গিয়েও থামলাম।

বলব? বলা কি ঠিক হবে? ডঃ ওয়েলচ বলেছিলেন, ভয়ের কোন ব্যাপার নিয়ে আগে বেশি কথা বললে ভয় বাড়ে। বরং অভিজ্ঞতা দিয়ে যে যেভাবে সেটা বুঝে ওঠে, সেটাই ভাল।

তবু আমার মনে হল, এঁরা সবাই তো বিজ্ঞানী, শক্ত শক্ত পরিস্থিতির সামনে এঁরাও পড়েছেন। অতএব আগে থেকে কিছুটা ইঙ্গিত দিলে ক্ষতি কী?

দু একবার ভাবলাম। কিন্তু না। শেষে ঠিক করলাম ডঃ ওয়েলচের কথা মেনে চলাই ভাল। আর তাছাড়া, অভিজ্ঞতাটা একেবারে যে নতুন হবে সেটাও তো ঠিক নয়?

এসব ভেবেই বললাম, ঠিক আছে। এবার আপনারা ঘুমোতে যান। সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত আপনারা আর বাইরে চলাফেরা করবেন না।

আমার এ কথার পর প্রায় সবাই চলে গেলেন। রইলেন শুধু

কার্ডিনি, কাপুর, গেরহার্ট এবং সুমিত্রা। সুমিত্রাকে আমি তার তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলাম।

না। রাত কথাটা বলা ভুল হবে। আগেই তো বলেছি, দক্ষিণ মেরুতে এ সময়ে অন্ধকার বলতে কিছুই থাকে না? একটা বিবর্ণ আলো আলতো ভাবে চারিদিক ভরে রেখেছে। যেন গোধূলির আলো। তবে তার চেয়ে কিছুটা স্পষ্ট।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হয়ত।

হঠাৎ কার করস্পর্শে জেগে উঠলাম।

দেখি ডঃ কার্ডিনি আমাকে সজোরে ঠেলে তোলার চেষ্টা করছেন।

কী ব্যাপার, ডঃ কার্ডিনি? রাত কত?

ঘড়িতে এখন একটা। কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? বললেন ডঃ কার্ডিনি।

হ্যাঁ, ঠিক শুনতে পাচ্ছি বৈকি? বললাম আমি।

তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম। দেখি তাঁবুর মৃদু আলোয় কাপুরেরও মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে মেরে গেছে। মনে হল অনেক আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। এখন আচ্ছন্নের মত বসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

ডঃ কাপুর? ডাকলাম আমি।

কিন্তু তাঁর জবাব পাওয়ার আগেই—!

শুনুন। কী বলব, ভৌতিক কাণ্ড? জানি না। আসলে কী যে ঘটেছিল আমি জানতাম। কিন্তু তার সত্যিকারের প্রভাব যে এতটা হতে পারে, কী করে জানব, বলুন?

শুনুন তাহলে। তাঁবুর বাইরে থেকে ভেসে আসছিল, ঠিক নেংটি ইঁদুর যেমন কুঁই কুঁই শব্দ করে, সেই রকম শব্দ। কিছুক্ষণ সেইভাবে চলল। তারপর শোনা গেল তীক্ষ্ণ শিস্। প্রথমে খাদে। তারপর চড়া। এত তীক্ষ্ণ তার শব্দ, মনে হল একেবারে মগজের মধ্যে ঢুকে সমস্ত কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে দেবে। অসহ্য কর্কশ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় শিসের ধ্বনির কথা পড়েছিলাম। গ্রামের লোকেরা তাকে অলৌকিক শব্দ বলে ভুল করে কী অসহ্য বিভীষিকা নিয়েই না জীবন কাটিয়েছিল। যদিও পরে দেখা গেল সেটা একটি সাপের শিস্।

জানি সেই শিসের ধ্বনি গ্রামের মানুষকে কেন আতঙ্কিত করেছিল। কিন্তু এখানে লৌকিক সভ্যতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই বরফের রাজত্বে যে শিসের শব্দ আমরা শুনলাম তার বুঝি কোন তুলনা নেই। বলব কি, মুহূর্তের জন্যে অদ্ভূত এক আবেশ আমাদের সবাইকে যেন গ্রাস করে ফেলল।

কিন্তু না। একটি অভিযাত্রী দলের নেতার দায়িত্ব অনেক। এবং কী কী ঘটবে সেও তো আমি জানতাম? ডঃ ওয়েলচই বলেছিলেন সব আমাকে। অতএব আবেশের ঘোর কাটিয়ে উঠতে আমার খুব একটা সময় লাগল না।

ডঃ কাপুর! চিৎকার করে উঠলাম আমি। এ সব কী করছেন আপনি? ভয় পাবার কোন কারণ নেই। এমন শব্দ পেঙ্গুইনে থাকার সময়ই তো শুনেছেন আপনি? ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

হঠাৎ এমন চিৎকারে তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ কাপুরের ঘোরটা যেন অনেকটা কেটে গেল। খানিকটা বিভ্রান্তির দৃষ্টি নিয়ে বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, ডঃ বাসু। এ এক অসহ্য শব্দ। আমি পাগল হয়ে যাব।

না, মশায়। পাগল হবার মত এতে কিছু নেই। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। কে কোথায় কী অবস্থায় রয়েছেন, দেখতে হবে। বলেই এক ঝটকায় ডঃ কাপুরকে বগলদাবা করে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। খুব সাবধানে রবারের জুতো পায়ে দিয়ে বেরোতে হল। কারণ শুকনো বরফের উপর ততক্ষণে যে প্রচুর বিদ্যুৎ আধান জমে উঠেছে তা সংকেত-যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা ধরতে

পেয়েছিলাম। পাছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হই তাই এই সাবধানতা। ডঃ হিহংও আমার সঙ্গে চললেন।

সবার তাঁবুতেই তখনও নীরবতা। গিয়ে দেখলাম সবাই আচ্ছন্নের মত বসে রয়েছে। যে ভাবে ডঃ কাপুরের ঘোর ভেঙেছিলাম, ঠিক সেইভাবে আরও সবার ঘোর ভাঙলাম। যদিও মুস্কিলে পড়তে হল হেলিকপ্টারের এক পাইলট কারমিলোকে নিয়ে। সে বেচারা দেখি ভয়ে প্রায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, বস্, এবার আমি পাগল হয়ে যাব। কী সাংঘাতিক শব্দ বলুন দেখি?

ডঃ গেরহার্ট এবং ডঃ কাপুরকে বললাম, কারমিলোকে ঠাণ্ডা করুন। আমি দেখে আসি সুমিত্রার কি খবর।

কিন্তু কি বলব আপনাদের। সবচাইতে বড় আঘাত পেতে হোল সেখানে এসেই। সুমিত্রা ভুল বকতে শুরু করেছে। আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল সে। ছুটে এসে সমস্ত রকম সামাজিক নিয়ম ভুলে গিয়ে ছোট্ট শিশুর মত জড়িয়ে ধরল আমাকে।

কী ব্যাপার? কিছুই হয়নি সুমিত্রা? সামান্য শব্দ। একে বলা হয় বরফের শব্দ। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই থেমে যাবে। বললাম আমি।

আমাদের দলের ডাক্তার রবিনসন পাশেই ছিলেন। এ সময়ে কী করতে হবে সে কথা আগেই তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি এতটুকু দেরি না করে ইনজেকশন দিয়ে সুমিত্রাকে অজ্ঞান করে দিলেন।

আপনার কি মনে হয়, ডক্টর। সত্যই ঘাবড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে বসলাম আমি।

রবিনসন বললেন, সাউণ্ড ট্র্যমা, ডঃ বাসু। আর কেউ না হলেও, সুমিত্রা মনে হচ্ছে কিছুটা যেন অ্যাফেকটেড্ হয়েছেন।

সুমিত্রাকে ধরাধরি করে আমার ঘরে নিয়ে আসা হল। আর ঠিক তখন মনে হল রাক্ষুসে শব্দ মসৃণ এবং খটখটে শুকনো বরফের গায়ে

প্রতিফলিত হয়ে দূরে কাছে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে: গর্জন নয়; তীক্ষ্ণ আর্তনাদ যেন।

শব্দ মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া করে জানা ছিল। কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া যে এমন প্রাণান্তকর সে কথা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম?

আকস্মিক এই ঘটনার কথা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলাম আমরা পেঙ্গুইনে অবস্থানরত বিজ্ঞানীদের। তাঁরা যোগাযোগ করলেন মূল নির্দেশক স্টেশন তিয়েরা দেল ফুয়েগোয় ডঃ ওয়েলচের কাছে। বলা বাহুল্য, শব্দের গতিপ্রকৃতি, চৌম্বক ক্ষেত্রের হঠাৎ পরিবর্তন, মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ, এ সবের উপর যত রকম তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব সমস্ত কিছুই তাঁকে জানান হল।

কিন্তু ততক্ষণে সুমিত্রাকে নিয়েই যত সব গোলমাল। যে ওষুধটি তার শরীরে ইনজেকট করা হয়েছিল, দেখা গেল তাতে কোন কাজ হল না। রবিনসন তখন অন্যান্য ওষুধের কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু মুশকিল এই, ভাবলেই তো হয় না? এলোপাথারি অজ্ঞান করার ওষুধ দিতে গিয়ে যদি কোন রকম অ্যালার্জি দেখা দেয়, তাহলেই তো সর্বনাশ। অথচ ওই অবস্থায় ফেলে রেখে দিলেও তো বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে।

হরিবল্! রবিনসন মন্তব্য করলেন। অসহ্য শব্দ, মশায়। আমি নিজেও পাগল হয়ে যেতে পারি।

আপনি কেন, সবাই পারেন। তবে যতক্ষণ তা না হচ্ছেন, একটু ঠাণ্ডা মাথায় চলাফেরার চেষ্টা করুন। বললাম আমি।

সুমিত্রা এবার চিৎকার করে ভুল বকতে শুরু করল। এতে কাজ হল এই, আর সবাই যেন তার ব্যাপারে খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠল, বুঝি আবিষ্ট সবাই। ক্লান্তও। আমি নিজেই কি ছাই সুস্থ কিছু। মোটামুটিভাবে যতটা পর্যবেক্ষণ আমরা চালিয়েছি, মানে যে সব পর্যবেক্ষণের জন্যে এখানে দলবল নিয়ে আসা, তার কথাই বলছি আর কি। সে সব মন্দ হয় নি। অনেক নতুন তথ্য এর মধ্যেই আমরা

সংগ্রহ করতে পেরেছি। মানে আমাদের যন্ত্রগুলি করতে পেরেছে। ওই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে আরও নতুন কিছু পর্যবেক্ষণের কাজে হাত দেওয়া যায় কী না, আজ সারা দুপুর তাই নিয়েই আমরা আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু কাজে হাত দেবার আগেই ঠিক যে আশঙ্কা ডঃ ওয়েলচ করছিলেন এবং যাকে গোড়ায় আমি তেমন কোন একটা ব্যাপার বলেই ভাবিনি, শেষ পর্যন্ত সেটাই ঘটে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, সুমিত্রা আমাদের সবাইকেই ভাবিয়ে তুলল। দানবিক উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা গুনতে লাগলাম।

আধঘণ্টা !

খবর এল পেঙ্গুইন থেকে, আর না। এবার ফিরতে হবে। স্টপ্ অল প্রোগাম। খবর পাঠিয়েছেন ডঃ ওয়েলচ স্বয়ং। তিনি আরও বলেছেন, আপনারা সবাই তাঁবুর মধ্যে থাকবেন। কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেখানে বজ্রপাতের সম্ভাবনা আছে।

এই সঙ্গে পেঙ্গুইন থেকে ক্যাপ্টেন আলবার্টের মেসেজ এল। জানিয়েছেন, সাবধান মশায়রা। আপনাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর যদি করুনা করেন, ঘণ্টা দুই পরেই আপনারা ফিরে আসতে পারবেন। আর না। এবার বাড়ি ফেরার পালা।

বজ্রপাত ? সে আবার কী ? এবার আমার কণ্ঠে বিস্ময়। ডঃ ওয়েলচ এ আশঙ্কাটার কথা আগে তো কখনও বলেন নি ? যদিও বুঝতে পারলাম কারণটা কী ? নিশ্চয় এর মধ্যে আশেপাশে প্রচুর পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জের আস্তরণ জমে উঠছে। তাদের তড়িৎ বিভবও প্রচণ্ড। মিলিত হয়ে ওই চার্জই বজ্রপাত ঘটাবে।

যাক, জটিল তত্ত্বের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। আসল কথা ডঃ ওয়েলচ যা বলেছিলেন এক ঘণ্টা নয়, আধঘণ্টার মধ্যেই তা ঘটে গেল। না, তার বর্ণনা দেওয়া কলমের আঁচড়ে সম্ভব নয়। কী প্রচণ্ড তার শব্দ ! সেই সঙ্গে বিদ্যুতের চমকানি যেন লক্ষ পাওয়ারের বিদ্যুতের বালবের ঝলসানি। তাঁবুর মধ্যে ঢেঁকে ঢুঁকে রইলেও

বুঝতে পারছিলাম আমরা। অবশ্য পরে, তাঁবুর বাইরে রাখা ফটোমিটারে ধরাও পড়েছিল।

যাক। বজ্রনির্ঘোষও থামল মিনিট দশেকের মধ্যে। এবং তারপরই হেলিকপ্টারে পেঙ্গুইন-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা। সুমিত্রার ঘোর তখনও কাটেনি। সুমিত্রাকে নিয়ে ডঃ কাপুর, আমি এবং গেরহার্ট একই হেলিকপ্টারে রওনা হলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো, ডঃ বাসু? এমন পাগল করার মত শব্দের মানে কি? প্রায় আধঘণ্টা স্থানুর মত বসে থাকার পর ডঃ কাপুর আমাকে প্রশ্ন করলেন। বুঝলাম, তিনি তাহলে খানিকটা চাঙা হয়ে উঠেছেন।

ডঃ কাপুরকে বললাম, বরফ রাজ্যের এই শিস্ ঠিক কী ভাবে ঘটে এখনও পর্যন্ত তা নিয়ে গবেষণা চলছে, ডঃ কাপুর। কেউ কেউ বলেন প্রচণ্ড ঝড় বরফের ধারাল কেলাসের গায়ে আঘাত করে এই শব্দ সৃষ্টি করে। পরে বারবার প্রতিফলিত হয় জোরাল হয়। কেউ কেউ বলেন, বরফের স্তরে ফাটল ধরার পর সেই ফাটলের মধ্যে জোরে বাতাস আনাগোনা করলেও এমন শব্দ শোনা যেতে পারে। যদিও ইদানীং কেউ কেউ বলছেন, বরফের এই দেশে যখন নিম্ন কম্পাঙ্কের তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ভূ-চুম্বকের যুগ্ম বিন্দু থেকে আসা চৌম্বক বলরেখা ববাবর এগোতে থাকে ওই শিসের শব্দ তখনই শোনা যায়। খুবই রহস্যের ব্যাপার, ডঃ কাপুর। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এই রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ এমনও মনে করেন ঊর্ধ্বাকাশে গিয়ে বেতার তরঙ্গ কেন মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়, এই শব্দের রহস্য একদিন সে সবের সন্ধান দেবে।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই আমরা এসে নামলাম পেঙ্গুইনের ডেকে। আলবার্ট ছুটে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। 'আপনারা তাহলে সাবাড় হন নি?' হাসতে হাসতে বললেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণেই সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললেন, আমি দুঃখিত। তবু বলব, এ অবস্থা

আপনাদের সবারই হতে পারত, ডঃ বাসু। আপনাদের দুর্ভাগ্য। এই রাক্ষুসে শিসের শব্দ ঠিক এখন শোনার কথা নয়। যদিও সেদিন জাহাজ থেকেই যখন শুনলাম, বুঝেছিলাম একটা কিছু ক্যাসাদে আপনারা পড়বেন। যাক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনারা ফিরে এসেছেন। আর ভয়ের হয়ত কোন কারণ নেই।

ক্যাপ্টেনের ঘরে যখন এসে বসলাম, তখন সন্ধ্যা। সুমিত্রা তখনও ঘুমোচ্ছে। আচ্ছন্নের মত। ডঃ রবিনসন জানালেন, ভয়ের কোন কারণ সত্যিই আর নেই। খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, বায়ার্ডের বুক যেন এক জীবন্ত বিভীষিকা।

এর পর কিছু দিন বিরতি। বায়ার্ড থেকে ফিরে আসার পর ডঃ ওয়েলচকে আমার যে পূর্ণাঙ্গ একটি রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল, এই ফাঁকে সে কাজটিও শেষ করে ফেলেছি। রিপোর্টের গোড়ায় বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা কুমেরু অঞ্চল সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারও উল্লেখ করলাম। লিখলাম, পৃথিবীর শীতলতম ওই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ষাট লক্ষ বর্গমাইল। দক্ষিণ মেরু দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দুই মাইল পুরু বরফের উপর। বলা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত পাহাড় পর্বত, সমুদ্র, সমতল ভূমি এবং দুই মেরু অঞ্চলে মোট যে পরিমান বরফ জমে রয়েছে তার শতকরা নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগই জমে রয়েছে কুমেরু অঞ্চলে। এই তথ্যটি উল্লেখ করে আমি মন্তব্য করেছিঃ কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে না? পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই বা এতটা বরফ জমছে কেন? কুমেরু অঞ্চল তা হলে কি এখন বরফ যুগে পড়ে রয়েছে? যদি তাই হয়, তা হলে কুমেরু নিয়ে আমাদের বিস্তারিত অনুসন্ধান চালানো দরকার। এতে করে আবহাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে হয়ত অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানতে পারব আমরা।

১৯৬০ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা দাবি করেন, কুমেরু অঞ্চলে

প্রতি বছর নতুন বরফ জমে ছয় শ' বারো ঘন মাইলের মত। এই বরফের বেশ কিছু অংশ ঝড়ের তোড়ে উড়ে গিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, কিছু অংশ ধীরে ধীরে ভেঙ্গে টুকরো হয় এবং উষ্ণতর সমুদ্র অঞ্চলের দিকে ভেসে যায় হিমবাহরূপে, কিছুটা বাষ্পীভূত হয়। এই ভাবে বছরে তিন শ' উনিশ ঘন মাইলের মত বরফ কুমেরু অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। অতএব বলা যেতে পারে সেখানে প্রতি বছর নতুন বরফ জমছে দু শ' তিরানব্বই ঘন মাইলের মত। আমার মন্তব্য, যদি সত্যিই এমনটি ঘটে থাকে, সেটা যাচাই করা দরকার। এতে করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা কখন, কোথায়, কী অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে সে ব্যাপারে আমরা একটা সুষ্ঠু ধারণা পেতে পারি।

আমরা প্রমাণ পেয়েছি, কুমেরু অঞ্চলে মহাজাগতিক রশ্মির মাত্রা কখনও দারুণভাবে বেড়ে যায়। আর যখন তা বাড়ে, তখন সেখানকার বায়ুমণ্ডলে মেরুপ্রভাব ঔজ্জ্বল্যও বাড়ে। মহাজাগতিক রশ্মির এমন খামখেয়ালি বর্ষণের কারণ কি ? ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু থেকে দক্ষিণ চৌম্বক মেরুর দূরত্ব কখনও এক হাজার মাইল, কখনও প্রায় দুই হাজার মাইলে গিয়ে দাঁড়ায়। এই দূরত্বের মধ্যে ওই মেরু নিয়ত স্থান পরিবর্তন করে। এরই বা কারণ কি ? মেরু-শব্দের সঙ্গে এই ঘটনার কি কোন সম্পর্ক আছে ?

রিপোর্টের শেষে মন্তব্য করেছি : কুমেরু অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান দরকার। অদূর ভবিষ্যতে খনিজ সামগ্রীর সন্ধানে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে সেখানে বাস করতে হবে। বাস করতে হবে আরও নানা প্রয়োজনে। মানুষের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য রিপোর্টে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং শারীরবৃত্তীয় ঘটনার ক্ষেত্রে যে সব নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তাদের কথা বলা হয়েছে।

রিপোর্ট পাঠানোর পর ফিরে এলাম কলকাতায়। সুমিত্রাকে নিয়ে যাওয়া হয় ওয়াশিংটনের একটি হাসপাতালে। সেখানে দিন

কুড়ির মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এবং তারপর বোম্বাই-এ তার কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসে।

কলকাতায় আসার পর মাঝে কয়েকটি উট্‌কো সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। বলতে পারেন, সেগুলিও যেন এক একটি ডিটেকটিভের গল্পের মতই রোমহর্ষকর ঘটনা। আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে সে সম্পর্কে পরে বলবো। কিন্তু তার আগে, ওই যে বায়ার্ড—প্রতি মুহূর্তে যার কথা আমি ভুলতে পারি নি, সেখানকার সেই রাক্ষসী ঝড়, সেই শব্দ—প্রতি মুহূর্তে যারা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—সেই বায়ার্ডে যাওয়ার আবার একটি সুযোগ ঘটে গেল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

এবার আর আলবার্ট নয়। আমন্ত্রণের জন্যে এবার যিনি এলেন, তিনি যেন এক অদ্ভুত মানুষ। বলতে কি, ডঃ কাপুর যদি তাঁকে একটি পরিচয় পত্র দিয়ে না পাঠাতেন, হয়ত আমি তাঁর সঙ্গে কথাই বলতাম না। অমন উড়ুক্কু চেহারার মানুষকে কেউ দেখলে অন্য কোন সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষও হয়ত তাই করতেন। যদিও পরে ভেবেছি, সেটা যদি করতাম, তা হলে তা দাঁড়াত সেই ক্ষ্যাপার পাথর ভেবে সত্যিকারের পরশমণি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ারই মত।

আমি অবাক হয়েছি!

এমন চাঞ্চল্যকর একটি ঘটনা কোন মানুষ যে ওই ভাবে বর্ণনা করতে পারে আমি ভাবতেই পারি নি। প্রথমে মনে হয়েছিল, লোকটা পাগল নয় তো? ডঃ কাপুর কি শেষে একটা পাগলকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তিনি তাঁর কাহিনীটি বলতে শুরু করলেন, বলতে কি, সত্যিই আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

আর তখন আমার ভাগ্যদেবতা মনে মনে হয়ত এ কথাই বলছিলেন, দাঁড়াও হে, এই তো শুরু। এবার তুমি বিপজ্জনক অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত হও দেখি! তখন ভাবতেও পারি নি, বিরাট ঝক্কির দিকে আবার আমি এগিয়ে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক তাঁর কাহিনীটি ঠিক এই ভাবে শুরু করলেন :

শুনুন, স্যার। সাহারা মরুভূমির মধ্যে এমন কিছু কিছু জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে গত তিরিশ বছরে এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েনি। মাইলের পর মাইল এগিয়ে যান শুধু বালি আর বালি। মাঝে মধ্যে দু-একটা ন্যাড়া পাহাড় চোখে পড়বে। তাদের এক একটি যেন এক একটি জ্যান্ত রাক্ষস। বিশেষ করে দিন যত বাড়তে থাকে, সূর্য দিগন্ত রেখা ছেড়ে যতই আকাশ পানে উঠে আসে পাহাড়গুলি তখন আগুনের শিখার মতোই জ্বলতে শুরু করে দেয়। সে যে কী দারুণ দৃশ্য, কী প্রাণঘাতী পরিস্থিতি আমাদের এই স্নিগ্ধ পরিবেশে, এই সবুজ গাছপালার স্নেহকোমল স্পর্শের মধ্যে যাঁদের বাস, কেউ কোনদিন বুঝতে পারবে না, ডাঃ বাসু! আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি কী বলতে চাই?

না।- লোকটির এই দীর্ঘ ভূমিকা শোনার পর এবং হঠাৎ আজগুবি এমন প্রশ্নের পর আমার মনে হোল এটাই আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর হওয়া উচিত।

ধন্যবাদ। আমি জানি, আপনার মত বিজ্ঞানীর পক্ষে এটাই বিচক্ষণের মত উত্তর। কারণ আসল ব্যাপারটা এখনও তো আপনাকে বলা হয় নি? সে সব না শুনলে কী করেই বা নিজের মতামত আপনি স্পষ্ট করে বলবেন। মাফ করবেন, ডঃ বাসু, আমি হয়ত আপনার অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছি। ফোনে কথা বলার সময় আপনি অবশ্য বলেছিলেন, সম্প্রতি একটি প্রাণঘাতী মহাকাশ গবেষণা করার পর আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বেশ কিছুদিন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন, কিন্তু—

—আপনার কিছু মনে করার কোন কারণ নেই। ডঃ কাপুরের কাছ থেকে আপনার কথা শুনেছি। একটা অদ্ভুত রকমের ইন্টারেষ্টিং ঘটনার কথা জানাতেই আপনি আমার কাছে এসেছেন, এ কথাও তিনি বলেছেন। তবে সেটা কী, তা তিনি জানেন না। গতকাল সকালে আপনি যখন ফোনে আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন তারপরই ডঃ কাপুরকে আমি ট্রাঙ্ক-কল করি। তিনি এখন উতকামণ্ডে। আপনার কথা বলতেই ডঃ কাপুর বেশ যেন খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কী সব বললেন, বরফ, চৌম্বক তরঙ্গ, আলট্রাসোনিক। অনেক কথাই বললেন। আসলে মনটা ব্যক্তিগত একটি ব্যাপারে তখন খুব বিক্ষিপ্ত ছিল বলে খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা আমি শুনি নি। তবে সংক্ষেপে উনি আপনার চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে আপনি হুবহু মিলে যাচ্ছেন। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময় আপনার নাম আপনি আমাকে বলেন নি। তবু বলব, ডঃ কাপুরের বর্ণনা যদি আমি বুঝে উঠে থাকি—হ্যাঁ—মানে—আপনার নাম ডঃ এস. জি. কে. রামচন্দ্রন। পাঁচ বছর আগে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে একটি জাহাজ ডুবিতে আপনি নিখোঁজ হয়েছিলেন। বলুন, আমার অনুমান কি ঠিক নয়?

লোকটি তাঁর চেয়ার থেকে লাফিয়ে এসে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আপনি যা বললেন সব ঠিক। আমিই ডঃ রামচন্দ্রন। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রিমেন্টাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার পথে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি ঝড়ে পড়ে আমাদের জাহাজ ভারত মহাসাগরের ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জের কাছে ডুবে যায়। তারপর থেকেই এই পাঁচ বছর সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। মাত্র মাসখানেক আগে ব্রাজিলে কয়েক মিনিটের জন্য ডঃ কাপুরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই সময় তিনিই আপনার কথা আমাকে বলেছিলেন। টেলিফোনে আমার পরিচয় আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে দিই নি, ডঃ বাসু। দিলেও হয়ত আপনি আমাকে চিনে

উঠতে পারতেন না। তাই ভেবেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা হলে সরাসরি কাজের কথাই পাড়ব। তারপর ব্যক্তিগত আলাপ করা যাবে?

আমি বললাম, সব শুনব। তার আগে দাঁড়ান একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। আমার আবার একক সংসার। আতিথেয়তার খানিকটা ত্রুটি হবে।

হাসলেন ড়ঃ রামচন্দ্রন। তাহলে আপনিও আমার মত বিয়ে থা করেন নি? ভালই করেছেন, আজকালকার মেয়েরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ওরা বুঝতে চায় না, জানতে চায় না।

এ কথায় কোন মন্তব্য না করে মদনকে কিছুটা খাবার এবং চায়ের কথা বলে আমি ডঃ রামচন্দ্রনের সামনে এসে বসলাম। এবার একেবারে মুখোমুখী।

আসলে কেন জানি না, প্রথম দর্শনের পর থেকেই লোকটিকে আমার ভাল লাগল। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ হবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিজের সাজসজ্জার ব্যাপারে মনে হল অনেকটা উদাস। বড় বড় চুল এবং দাড়ি। হাল্কা নাল রঙের হাফসার্ট এবং নেভি রঙের ট্রাউজারে তবু তাঁকে অদ্ভুত মানিয়েছিল। এবং সব চাইতে আকর্ষণীয় তাঁর দুটি চোখ। উজ্জ্বল দুটি চোখ শুধু প্রতিভার দীপ্তি নয়, একটা প্রচণ্ড মমতার ছাপ। তাঁর চোখ দেখলেই মনে হয় এ মানুষ সবার জন্যে নিজেকে উজাড় করে দিতে জানে।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, আমি একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী।

জানি। ডঃ কাপুর আমাকে বলেছেন। আমার উত্তর।

ফ্রিমেন্টাল থেকে একটা প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরছিলাম অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর উপর কয়েকটি নতুন তথ্য সংগ্রহ করে। ভেবেছিলাম প্রথমে যাব আফ্রিকায়। কারণ ওই ধরনের আদিবাসীর সন্ধান দক্ষিণ আফ্রিকায় মোজাম্বিক অঞ্চলেও পাবো বলে আমার বিশ্বাস ছিলো। একই ধরনের মানুষ। একই পরিবারের। অদ্ভুত ব্যাপার

এই, কোথায় আফ্রিকা আর কোথায় অস্ট্রেলিয়া। দুই এর মাঝখানে ভারত মহাসাগর। দুস্তর এই মহাসাগর পেরিয়ে আফ্রিকার মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় গেল কী করে? অথবা ধরে নেওয়া যাক অস্ট্রেলিয়া থেকেই কয়েক হাজার বা লক্ষ বছর আগে তাঁরা যদি আফ্রিকায় গিয়ে থাকে, সেটাই বা কী করে সম্ভব? কিন্তু কি বলব মশায়, ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জের কাছে যে অমন একটি ফ্যাসাদ হবে, কে জানত? সমুদ্রের জলে আমার সমস্ত কিছু কাগজপত্র কোথায় হারিয়ে গেল। আর আমি

মানে—এখানে ডঃ রামচন্দ্রনকে একটু বাধা দিলাম আমি। কারণ এতক্ষণ ওঁর কথাবার্তা শুনে মনে হোল, আসল ব্যাপার যেন তিনি গুলিয়ে ফেলছেন। যা বলার জন্যে উনি আমার কাছে এসেছেন সেটা না বলে অন্য সব কথা বলছেন বেশি। বড় বড় বিজ্ঞানীর এই একটা দোষ। কথা বলার সময় বেশির ভাগই আসল ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে পারেন না। তাই মাঝপথে তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম—রামচন্দ্রন, মানে গোড়ায় আপনি সাহারা সম্পর্কে কি যেন বলতে চাইছিলেন না?

হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম, বললেন ডঃ রামচন্দ্রন। না, ঠিক সাহারা নয়। সাহারার ব্যাপারটা উদাহরণ মাত্র। আমি বলতে চাইছিলাম, সাহারার চেয়েও ভয়ঙ্কর জায়গা এ পৃথিবীতে আছে। বিশ্বাস করুন ডঃ বাসু, সেখানকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কেই আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি। বরফ। শুধু বরফ। বলছিলাম, সাহারার কোন অঞ্চলে এক নাগাড়ে ত্রিশ বছর বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সেই জায়গাটা, মাত্র তিনমাস আগে যেখানে আমাকে বাস করতে হয়েছে, সেখানে সৃষ্টির পর থেকেই হয়ত এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি, ডঃ বাসু। আর—!

হঠাৎ থেমে পড়লেন তিনি। মদন চা আর জল খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল খাবারগুলি সে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগল।

কেমন যেন সন্দেহের চোখে চাইলেন ডঃ রামচন্দ্রন মদনের দিকে। তারপর আমার দিকে চেয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইংরেজী বোঝে?

কার কথা বলছেন ?   মদন ?

হ্যাঁ।

না। কেন বলুন তো ? খানিকটা কৌতূহলী হয়ে উঠলাম আমি। কারণ গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিলাম সব সময় কেমন যেন একটা সন্দেহ বাতিক তাঁর।

মদন চা জল খাবার সাজিয়ে রেখে চলে গেল।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, ব্যাপার কি জানেন ডঃ বাসু, আমি চাই না সব কিছু হেস্ত নেস্ত হয়ে যাবার আগে আমার পরিকল্পনার কথা অন্য কেউ জানুক। কি বলব জানেন, পৃথিবীটার উপর আমার আর কোন বিশ্বাস নেই। আপনাকে ধন্যবাদ। ধৈর্য নিয়ে তবু আমার কথা আপনি শুনছেন। কিন্তু এর আগে সারা পৃথিবীর কম করেও এক ডজন লোককে আমার কথাটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কেউ আমার কথায় কান দেয় নি। বরং এমন মন্তব্যও করতে শুনেছি, আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভুল বকছি আমি। কিন্তু কি বলব, মশায়, আপনাকে, চোখের সামনে পাঁচটি মানুষ ওমনি করে মরে গেল। আর প্রত্যেকটি ঘটনাই ঘটল ঠিক রাত তিনটের সময়। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, সে কি শব্দ। আমাদের চারপাশের তাপমাত্রা শূন্যেরও ষাট ডিগ্রি নীচে। বিশ্বাস করুন অত শীতেও কেউ আমরা মরলাম না। অথচ একটা প্রচণ্ড শব্দ আর তার সঙ্গে—! আমি বায়ার্ড উপদ্বীপের কথা বলছি ডঃ বাসু।

কি সাংঘাতিক কাণ্ড ! আপনি কি দক্ষিণমেরুর বায়ার্ডের কথা বলছেন, ডঃ রামচন্দ্রন ? আমার জিজ্ঞাসা।

তাছাড়া পৃথিবীতে ক'টি বায়ার্ড আছে বলুন ? কিন্তু এ সব কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তাই আমি পছন্দ করি না, আপনি ছাড়া আর কেউ আমার কথা শুনুক।

আপনার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম।

ধন্যবাদ।

ডঃ রামচন্দ্রন চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলেন।

চা পানের পর ডঃ রামচন্দ্রন একবার নিজের হাতঘড়িটির দিকে চেয়ে বললেন, না। আর বসব না। এখন আমি উঠব, ডঃ বাসু। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাকে এখনই একবার হোটেলে যেতে হবে। মঙ্গাকে ডাক্তার দেখতে আসবেন। এ সময়ে সেখানে আমার থাকা দরকার।

মঙ্গা! সে আবার কি?

পরে বলবো।

কোন হোটেলে উঠেছেন আপনি?

পার্ক হোটেলে।

আপাতত কিছুদিন থাকবেন তো এখানে?

কতদিন থাকবো সেটা এখন নির্ভর করছে আপনার ওপর। আগামী কাল সন্ধ্যের দিকে আমি আসছি। পুরোপুরি কথাবার্তা তখনই শেষ করা যাবে। এখন উঠি। নমস্কার।

নমস্কার।

দোর অব্দি এগিয়ে দিলাম ডঃ রামচন্দ্রনকে।

তিনি চলে গেলে নিজের স্টাডিতে এসে বসলাম।

অদ্ভুত একটা কৌতূহল আরও যেন দানা বেঁধে উঠল। কে এই ডঃ রামচন্দ্রন? নিজেকে একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী বললেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল এই বিষয় নিয়ে তিনি বেশ কিছুটা মৌলিক কাজকর্মও করেছেন। কিন্তু জাহাজ ডুবির পর একেবারে বায়ার্ড উপদ্বীপে যাত্রা। কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি? বললেন, প্রচণ্ড শব্দ। পাঁচ জনের মৃত্যু। মঙ্গা কে? নামটা শুনে মনে হচ্ছে কোন আদিবাসী। এসব ভাবতে ভাবতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যের দিকে মদনকে বললাম, আমি একটু বেরুচ্ছি মদন, নটার মধ্যেই ফিরব। খুব একটা খাওয়ার ইচ্ছে নেই আজ। সামান্য কিছু রেঁধে রেখো।

সারাদিন ব্যক্তিগত কয়েকটি ঝামেলায় মনটা একটু বিক্ষিপ্ত ছিল। ভাবলাম একটু ঘুরে আসি এদিক সেদিক। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে সোজা ময়দানের দিকে চললাম। ছুটির দিন নয়, শহর কলকাতায় এ সময়ে ভিড়টা কেমন বাড়ে সে তো সবাই আপনারা জানেন। সত্যিই, শহরটা জনতার চাপে যেন ফেটে পড়েছে দিন দিন। এবার জুন মাসেও তেমন বৃষ্টি হলো না। গুমোট গরমে দিনটা হাঁস ফাঁস করে কাটে। ছুটি না থাকলে তবু কাজের ফাঁকে এ সব অনুভব করার কিছু থাকে না। কিন্তু ছুটি নিয়ে বসে আছি। একক সংসার। ঘরেই বা কার সঙ্গে কথাবার্তা বলবো? যখন কলকাতায় থাকি বিকেলের দিকটা গড়ের মাঠ অথবা আউটরাম ঘাটের গঙ্গার ধারে কাটাই। মন্দ লাগে না।

না। পার্ক স্ট্রীটের কাছে এসে মনে হল গঙ্গার দিকেই যাই। বাঁ দিকে ঘুরে রেড রোড ধরে আকাশবাণী ভবনের পাশ দিয়ে আউটরাম ঘাটের দিকে এলাম। তারপর গাড়িটি ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে ঘাসের পাশ বরাবর পার্ক করে নেমে পড়লাম।

গঙ্গার ওপারে কোন এক কারখানার চিমনির পাশে সূর্য অস্ত গেল এই মাত্র। চিমনিটির ধুঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে তার চারপাশটায়। এ পাড়ে গঙ্গার ধারে ভিড়। নানা প্রদেশের, নানা বেশভূষায় কত রকমের মুখ। যাদের দেখলে মনে হয় না, পৃথিবীতে দুঃখ দারিদ্র্য বলে কিছু আছে। সেই ভিড়ের মাঝে আমিও একজন।

পায়চারি করছিলাম এক মনেই। মাঝে মাঝে ডঃ রামচন্দ্রনের কথা ভাবছি। ভদ্রলোক আজ আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর অনেক কথাই যেন বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কী, জানি না। আর বার বার একটা কথাই মনে হচ্ছিল, বায়ার্ড উপদ্বীপে উনি গেলেন কী করে? কুমেরু অঞ্চলের ওদিকটায় কোন মানুষ টিকে থাকতে পারে এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ডঃ দত্ত মনে হচ্ছে না?

হ্যাঁ, ডঃ দত্তকেই তো দেখছি। তাহলে তিনিও সান্ধ্য ভ্রমণে মাঝে মাঝে এদিকে আসেন? সস্ত্রীক বেরিয়েছেন দেখলাম। আমার কাছেই এসে পড়েছেন।

ডঃ দত্ত, শুভ সন্ধ্যা। মিসেস দত্ত আপনাকেও। তাহলে আপনারাও এদিকে আসেন? কথা বললাম আমি।

আরে, ডঃ বাসু! শুভ সন্ধ্যা। কবে এলেন আপনি? ওঃ! সেবার উতকামণ্ডের সেই বেতার তরঙ্গ নিয়ে যা করলেন আপনারা। ভাবা যায় না, মশায়। এগিয়ে এসে ডঃ দত্ত আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

দিন দশ এসেছি। কেমন আছেন আপনারা? আমার প্রশ্ন।

ভালই। কিন্তু এই আপনার দোষ, মশায়। কলকাতার ছেলে। অথচ বিদেশ বিভূঁই-এই কেটে যায় সবটা সময়। যদিও বা আসেন কোন সাড়া শব্দ দেন না।

এবার পরিবারগত কারণে একটু জড়িয়ে পড়েছি, ডঃ দত্ত।

হাসালেন আপনি। মন্তব্য করলেন মিসেস দত্ত—যার পরিবারই নেই তার আবার পরিবার নিয়ে মাথা ব্যাথা।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। জানি না, ভদ্রমহিলাকে কেন যেন আমার ভাল লাগে। বছর তিরিশ বয়েস, সাদামাটা সুন্দরী। কিন্তু তারই মধ্যে একটা মমতাময় আকর্ষণ আছে তাঁর মধ্যে। শুনেছিলাম, বাবা বেঁচে থাকতে ওর সঙ্গে আমার নাকি বিয়ের কথা হয়েছিল। কথা চলতে চলতেই বাবা মারা যান, কথা আর এগোয় নি।

ডঃ দত্তও লোক ভাল। আমার থেকে বছর দুই বড়। পরিচয় অন্ততঃ দশ বছরের। মানব-বিজ্ঞানে এর মধ্যে বেশ কিছু ভাল কাজও করেছেন তিনি।

কথাটা মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করে বসলাম, আচ্ছা ডঃ দত্ত, আপনি তো অ্যানথ্রোপলজিস্ট। ডঃ রামচন্দ্রন বলে কাউকে চেনেন?

এমন একটি প্রশ্নের জন্যে ডঃ দত্ত যেন প্রস্তুত ছিলেন না। আমার কথায় হঠাৎ কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তাঁকে চেনেন ?

না। মিথ্যেই বললাম আমি।

অমন একটি বিজ্ঞান সাধক ভারতে জন্মেছিল, এ যেন ভাবা যায় না। তাঁর সঙ্গে আমার দুবার কথা বলার সৌভাগ্য হয়। একবার নতুন দিল্লীতে, আর একবার বাঙ্গালোরে। খুব কম বয়সে তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন। বিশেষ করে আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, এইসব অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে গত দশ বছর তিনি গবেষণা চালান। তাঁর ধারণা আফ্রিকার মোজাম্বিক এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীনতম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এক সময়ে নাকি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বছর কয়েক আগে এক জাহাজ ডুবিতে তিনি মারা যান।

ডঃ রামচন্দ্রন মারা যান নি, ডঃ দত্ত।

তার মানে ?

আপনাকে একটু মিথ্যে কথা বলেছি। আশাকরি ক্ষমা করবেন। ডঃ রামচন্দ্রন এখন কলকাতায়। আজ বিকেলে আমার ফ্ল্যাটে তিনি এসেছিলেন।

রামচন্দ্রন বেঁচে আছেন ? ডঃ দত্তের কণ্ঠে এবার রীতিমত বিস্ময়।

বেঁচে আছেন এবং—

দাঁড়ান, দাঁড়ান, মশায়। আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ ডুবি হয়েছিল সে খবর তো কাগজে বড় বড় হরফে বেরিয়েছিল। অবশ্য তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি, তখন এটুকু সংবাদই শুনেছি। কলকাতায় কোথায় উঠেছেন তিনি ?

কোন একটি হোটেলে। ডঃ রামচন্দ্রন চান না তিনি এখন কলকাতায় সে কথা কেউ জানুক। একমাত্র সরকারি কাস্টম ছাড়া কাউকেই বলা হয় নি। কী যেন কতকগুলি কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি। বলছিলেন একজন ভাল পদার্থবিজ্ঞানীর সাহায্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন। আরও কী সব বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সময় না থাকায় আজকের মত চলে গেলেন। আচ্ছা ডঃ দত্ত, মজা

এমন ধরনের নাম ঠিক কোন দেশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত বলতে পারেন ?

মঙ্গা ? তা নিকোবর, অথবা আরও দক্ষিণের দ্বীপে-টিপে ওই ধরনের নাম আদিবাসীদের মধ্যে শোনো যায়। খুব প্রাচীন জাতি এবং হিংস্র শুনেছি। এ নাম আপনি পেলেন কোথায় ?

ডঃ রামচন্দ্রন বলছিলেন।

আশ্চর্য।

আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না।

আপনার সঙ্গে কি ওঁর আবার দেখা হবে ?

আগামীকাল উনি আবার আমার কাছে আসবেন বলে গেছেন।

আমার বড় ইচ্ছে ওঁর সঙ্গে দেখা করি একবার। আপনার কি মনে হয় ? সম্ভব ?

এখন কিছুই বলতে পারবো না। কাল দেখা হোক। যদি সম্ভব হয় আমি পরে আপনাকে জানাবো।

কথা বলতে বলতে আমরা প্রায় অনেকটা পথ চলে এসেছিলাম। ঘড়িতে সাতটা।

ডঃ দত্ত বললেন, চলুন, এবার ফেরা যাক। আমরা অনেকটা এসে পড়েছি। মাথার উপর খানিকটা মেঘ জমেছে মনে হচ্ছে। বৃষ্টি আসতে পারে।

সত্যিই তো। কথা বলতে বলতে আকাশের দিকটা আমাদের খেয়ালই ছিল না ? চলুন একটু জোরেই পা চালানো যাক। মিসেস দত্তর একটু অসুবিধে হবে হয়ত। বলেই পা বাড়ালাম আমি।

মিসেস দত্ত বললেন, আজকালকার মেয়েরা পিছিয়ে আছে বলে কি আপনার মনে হয় ?

স্বভাবসুলভ ভাবে আমি মন্তব্য করলাম, নো কমেণ্ট।

হাসলেন ডঃ দত্ত। মিসেস দত্তর দিকে চেয়ে বললেন, কেমন কূটনীতিবিদ্‌দের মত উত্তর হল, শুনলে তো ?

আমরা সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম।

না। জল হবে মনে হচ্ছে। থমথমে ভাবটা কেটে গিয়ে একটা দখিনে হাওয়া বইতে শুরু করেছে ততক্ষণ। বাঁ পাশে পরপর জাহাজগুলি দাঁড়িয়ে। তাদের মাস্তুল ও ডেকের ওপর আলোক-সজ্জা একটা দেয়ালির পরিবেশ সৃষ্টি করে মনটা কেড়ে নিচ্ছিল। সন্ধ্যের হাওয়া-বিলাসীরা ততক্ষণে জোর কদমে পা চালাতে শুরু করেছে। মিনিট সাতেকের মধ্যেই ডঃ দত্ত তাঁর গাড়ির কাছে এসে গেলেন।

গাড়িতে উঠতে উঠতে মিসেস দত্ত বললেন, একদিন সময় করে আসুন না আমাদের ওখানে।

যাব।

ওঁরা চলে গেলেন।

বৃষ্টি নামলো তারপরই নিজের গাড়িতে আসতে আসতে খানিকটা ভিজেই গেলাম। তবু খারাপ লাগছিল না। শুধু ভয় এই, জোর বৃষ্টি হলেই মুশকিল! কলকাতা নগর পরিকল্পনার কর্মকর্তারা পথঘাট যে-ভাবে খুঁড়ে রেখেছেন গাড়ি ঘোড়া নিয়ে পথ চলা শক্ত।

আকাশবাণীর কাছে আসতেই বৃষ্টি নামল জোরে, প্রচণ্ড বৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। ভাল করে দেখা যাচ্ছে না কিছু।

তবে অসুবিধে হয় নি। দক্ষিণ কলকাতায় যে পাড়ায় আমার ফ্লাট সেখানটায় তেমন জল জমে না। ফিরলাম সাড়ে আটটা নাগাদ। পথে কিছুটা সময় গেল জ্যামের মধ্যে পড়ায়।

পরদিন ঘুম ভাঙলো খুব ভোরেই। সত্যি কথা বলতে কি গতকাল ডঃ দত্তের সঙ্গে কথা বলার পর ডঃ রামচন্দ্রন সম্পর্কে কৌতূহলটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। বার বার একটি কথাই ভাবছিলাম, সত্যিই কি ডঃ রামচন্দ্রন বায়ার্ড উপদ্বীপে গিয়েছিলেন? বললেন তাঁর নাকি কয়েকজন সঙ্গী অস্বাভাবিক ভাবে সেখানে মারা গেছে। এইসব

চিন্তায় রাতে ঘুমোতে যে পেরেছি, বলবো না। বায়ার্ডে যাবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। পরপর দুবার আন্তর্জাতিক অভিযাত্রী-দলের সদস্য হিসেবে সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্র মাপার জন্যে গিয়েছিলাম। সে অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের আগেই তো বলেছি। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রতি মুহূর্তে আমি ডঃ রামচন্দ্রনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

যদিও জানি, তিনি বলে গেছেন সন্ধ্যের সময় তিনি আসবেন।

সকাল আটটা নাগাদ টেলিফোন কল পেলাম ডঃ রামচন্দ্রনের।

ডঃ বাসু কথা বলছেন ?

আমি ডঃ বাসু বলছি।

সুপ্রভাত। মঙ্গা ভাল আছে। আজ সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ আমি যাচ্ছি। সঙ্গে আর একজন থাকতে পারেন।

তাঁর পরিচয় জানতে পারি কি ?

এখন না, ডঃ বাসু। আমরা আসি, তখনই জানবেন। প্লিজ। আচ্ছা, এখন রাখছি কেমন ?

কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে ছ'টায় একটি ট্যাক্সি আমার ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালো। মদন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলল, কালকের সেই সাহেব এলেন।

অদ্ভুত ভালো ছেলে এই মদন। বছর কুড়ি বয়েস। কথা বলে কম। কিন্তু প্রচণ্ড চালাক। বছর আট আগে সে কলকাতায় এসেছিল গ্রামের এক দাদার সঙ্গে চাকরীর সন্ধানে। তারপর কোন কিছু না করতে পেরে দাদাটি কোথায় পালিয়ে যায়। এক রকম ফুটপাত থেকেই ওকে আমি সংগ্রহ করেছিলাম। কলকাতা ছেড়ে আমি যখন দূরে থাকি সংসারের পুরো দায়িত্ব তখন ওর ওপরই থাকে।

রামচন্দ্রন যে বেশ একটা মান্যগণ্য লোক গতকালই মদন সেটা আঁচ করেছিল। তাই তিনি এখানে আসার আগে থেকেই অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল সে। টেরিকটের সার্ট, ট্রাউজার, মানে যাকে

বলে খোপ দোরস্ত। আর ছ'টা বাজার আগে থেকেই ঠায় জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমার ফ্ল্যাটটি দোতলায়। বড় রাস্তার ধার ঘেঁষে।

যা, সায়েবকে নিয়ে আয়, বললাম আমি। বলেই আমি আমার স্টাডিতে চলে গেলাম।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ডঃ রামচন্দ্রন এলেন। আর তাঁর পেছনে যিনি ঘরে ঢুকলেন—ডঃ নেগুচি মনে হচ্ছে না? আমি তো অবাক্।

পেছনের ভদ্রলোকও আমার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন থমকে দাঁড়ালেন।

ডঃ রামচন্দ্রনের সঙ্গে করমর্দন করলাম।

ডঃ রামচন্দ্রন তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করার জন্যে হাত বাড়ালেন। ইনি—

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে আমিই বলে ফেললাম, আমার যদি ভুল না হয়, আমি ডঃ নেগুচিকে দেখছি না?

ডঃ বা—সু! নেগুচি সজোরে আমার হাত দুটি চেপে ধরলেন।

তাজ্জব কাণ্ড! আমার তাহলে কোন কেরামতিই রইল না। আপনারা পরস্পরকে চেনেন দেখছি। ডঃ রামচন্দ্রও অবাক্।

সা—টেনলি। হোয়াই নট্! উই ওয়ারর্কড্ টুগেদার অ্যাট দ্য বায়ার্ড! ডঃ নেগুচির মন্তব্য। পরে ডঃ রামচন্দ্রনের দিকে চেয়ে বললেন দিস ইজ অ্যাওফুল, ডঃ রামচন্দ্রন। আপনি তো আমায় বলেন নি, আপনি ডঃ বাসুর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন? হি ইজ্ মাই ওলদ ফ্রেনদ্!

স্ট্রেঞ্জ্ কোইনসিডেনস্! বললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

আমরা সবাই এসে জুৎসইভাবে বসলাম।

মদন চা জলখাবার আনতে বেরিয়ে গেল।

বলুন, আপনার মঙ্গা কেমন আছে, ডঃ রামচন্দ্রন। প্রথম কথা বললাম আমি।

ভালো। আমি ভাবতে পারি নি আপনাদের কলকাতায় এত ভালো ডাক্তার আছে। একেবারে ছেলেমানুষ, মশায়। কত আর বয়েস হবে। বছর তিরিশ? বাট হি একজ্যাকটলি আনডারস্টুড দ্য ট্রাবল। মঙ্গা এখন বিপদ কাটিয়ে উঠেছে। বললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না।

বলছি, বলছি। তার জন্যই তো আসা।

কথা বলেই সরাসরি একেবারে কাজে নেমে পড়লেন ডঃ রামচন্দ্রন। ছোট্ট একটি হাত ব্যাগ থেকে বের করলেন এক টুকরো কাগজ। তার সঙ্গে আর এক টুকরো কাগজ।

তারপর শুরু করলেন এক অদ্ভুত কাহিনী। বিশ্বাস করুন, বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়ে মনে হল ডঃ রামচন্দ্রন যেন অবিশ্বাস্য রকমের এক অলীক জগতের কথা বলতে শুরু করলেন।

ডঃ রামচন্দ্রনের কাহিনী।

এটা তো ১৯৭৫। তাহলে সাত বছর পিছনে ফিরে গেলে দাঁড়াবে ১৯৬৮। আমি তারও এক বছর পেছনে ফিরে যেতে চাই। এসব আপনাদের জানার কথা নয়, ডঃ বাসু। তখন আমি প্রশান্ত মহাসাগরের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ধরে প্রাচীন মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সম্প্রতি হয়তো কাগজে পড়ে থাকবেন, দক্ষিণ আমেরিকার ইক্যুয়াডোরে দুটি উপত্যকার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে একটি মানুষের মাথার জীবাশ্ম পাওয়া যায়। কেমব্রিজের জনৈক বিজ্ঞানী রেডিও কার্বন এবং থার্মাল ল্যুমিনসেন্স বা তাপ-প্রতিপ্রভা এই দুটি পদ্ধতিতেই এই খুলির জীবাশ্ম যাচাই করে মন্তব্য করেছেন, খুলিটির বয়েস কম করেও আটাশ হাজার বছর। বলতে পারেন, দুটি পদ্ধতি যখন কাজে লাগানো হয়েছে তখন এই হিসেবে কোন ভুল থাকার কারণ নেই। মানুষের সংগ্রহে এটাই এখন প্রাচীনতম খুলি।

না, আমি আপনাকে মানুষের মাথার খুলি নিয়ে কোনো গবেষণামূলক তত্ত্ব বলতে যাচ্ছি না। আমার প্রশ্ন দুটি। এক, এই খুলির সবগুলি অংশ পাওয়া যায়নি। তার দাঁতগুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে, প্রাচীন, বলতে পারেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই মানুষ যে কারণেই হোক সম্ভবত আফ্রিকা অথবা এশিয়া থেকে একদিন আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। প্রশ্ন, এক, তা যদি হয়, কী ভাবে তারা সেখানে গেল? দুই, হয়ত দুটি পথ থাকতে পারে। এক, থর হেয়ারদাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রা' তে যা বলতে চেয়েছেন। আফ্রিকা থেকেই একদিন তারা প্যাপাইরাস গাছের নৌকায় চড়ে প্রথমে আটলান্টিক, পরে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতে ভেসে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে কোথায় গিয়ে নামে। দুই, আবার এমনও হতে পারে, এখন যেখানে বেরিং প্রণালী এক দিন সেখানে জলের বদলে হয়ত ছিল সঙ্কীর্ণ স্থলপথ। যাকে যোজক বলতে পারেন। এখন সেটা সাগরের নিচে তলিয়ে গেছে। হয়ত ওই পথেই পায়ে হেঁটে তারা উত্তর আমেরিকায় গিয়ে হাজির হয়ে থাকবে। তারপর স্থল পথে উত্তর থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে ক্রমে তারা ছড়িয়ে পড়ে।

না, এসব নিয়ে আমি আপনার কাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করতে চাইনে। আমার বক্তব্যটি ভিন্ন। দাঁড়ান, আমার তৈরী এই ম্যাপটি একবার আপনি লক্ষ্য করুন।

বলেই ডঃ রামচন্দ্রন আমার সামনের টেবিলের ওপর ম্যাপটি মেলে ধরলেন।

ডঃ নিগুচি এবং আমি ম্যাপটির ওপর চোখ বোলাতে লাগলাম।

রঙিন কোনো মানচিত্র নয়। শুধু সাদা কাগজের ওপর অসংখ্য দ্বীপ। একদিকে অস্ট্রেলিয়া, আর এক দিকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ। তার ডান পাশে দক্ষিণ আমেরিকার হর্ণ অন্তরীপ। তারা সবাই যেন দক্ষিণে পরস্পর পরস্পরের দিক মুখ করে

দাঁড়িয়ে। কিছু দূরে আরও বিন্দু বিন্দু ভূ-খণ্ড। অসংখ্য পাহাড়ে ঘেরা। তবে বরফ টরফ যেন কম। দক্ষিণের সেই বিস্তৃত ভূ-খণ্ড এবং উত্তরের অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে সমুদ্রে পূব থেকে পশ্চিম বরাবর অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ। তবে তারা অনেক কাছাকাছি যেন। এবং লক্ষ্য করার মত, অস্ট্রেলিয়া থেকে লাল একটি লাইন টেনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণের সেই বিস্তৃত ভূখণ্ড। সেই ভূ-খণ্ডের সঙ্গে লাল লাইন টেনে জোড়া অসংখ্য দ্বীপ, উত্তমাশা অন্তরীপ এবং হর্ণ অন্তরীপ।

ডঃ রামচন্দ্রন বলতে লাগলেন, এই হলো গিয়ে আমার ম্যাপ। আজ থেকে, ধরুন এক লক্ষ বছর আগের পৃথিবীর ম্যাপ। এক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চল যেমনটি ছিল। এতে তাই দেখানো হয়েছে। বিশিষ্ট ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্যাট নেলসন এই ম্যাপটি তৈরী করতে আমাকে সাহায্য করেছেন।

আপনি কি ইউনিভার্সিটি অফ টেকসাসের অধ্যাপক নেলসনের কথা বলছেন, ডঃ রামচন্দ্রন? ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমার অ্যাপার্টমেন্ট ছিল ৭৩৭৩ নম্বর রিওগ্রান্দে। উনি বাস করতেন লামার এবং ১৮ নম্বর রাস্তার সংযোগস্থল থেকে যে ঢালু রাস্তাটা কলোরেডো নদীর ঝাঁড়ির কাছ বরাবর নেমে গেছে তার পাশে। বিকেলে প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা হতো। ওই সময় অনেক স্বাস্থ্যান্বেষী কলোরেডোর পাশ বরাবর ঝোপঝাড়ে ভরা রাস্তা ধরে দৌড়ঝাঁপ করে দেখেছি। অধ্যাপকও তাঁদের একজন। দেখা হলেই বলতেন, 'ইয়ংম্যান' তোমরা বুঝবে কী? আমার বয়েস তোমার ডবল। এই বয়েসে যখন পড়বে তখন দেখবে বাঁচার তাগিদটা কেমন বেড়ে যায়। পৃথিবী ছেড়ে মরতে যাওয়া? হরিবল! ভদ্রলোক খুব মুটিয়ে গিয়েছিলেন।

দেখছি, অধ্যাপক নেলসনকে আপনিও চেনেন। কুমেরু অঞ্চলে

মহাসাগরের নিচেকার ভূত্বক নিয়ে তিনি ভাল কাজ করেছেন। বললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

বলবো কি, অধ্যাপক নেলসনই আমাকে চমকে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছাকাছি কেপটাউনের প্রায় তু'শ মাইল দক্ষিণে, —এই যে ম্যাপটা। লক্ষ্য করুন একবার। এই যে খুদে খুদে সব কালো ফোঁটা দেখছেন—এই দ্বীপের একটিতে নেলসনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তিনিই বললেন, অদ্ভুত ব্যাপার ডক্! গত এক লক্ষ বছরে পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চলটায় যে এমন খামখেয়ালীপনা চলে ছিল, এতো জানা ছিল না?

কেন, কী হল আবার? আমার প্রশ্ন। বললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

অধ্যাপক নেলসন বললেন গতকাল দক্ষিণ দিকে এখান থেকে মাইল পনের দূরে ভারত মহাসাগরের এক জায়গায় আমি এবং ডিক ডুব দিয়েছিলাম। জলের প্রায় আধ মাইল নিচে আমরা একটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেছি।

তা ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে তো শুনেছি আখছাড় আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

জানি। কথাটা তা নয়। মনে হচ্ছে এই আগ্নেয়গিরিটা এখনও মরে যায়নি। আর তার চেয়েও বড় কথা—আচ্ছা দাঁড়ান, শুধু বক বক করে কী হবে। নিজের চোখেই দেখুন না। বলেই অধ্যাপক নেলসন তাঁবুর মধ্যে গিয়ে একটি পলিথেলিনের ব্যাগ নিয়ে এলেন।

বিশ্বাস করুন, ডঃ বাসু। সে সব দেখে সত্যিই আমিই চমকে উঠেছিলাম। দেখলাম পলিথেলিন ব্যাগের মধ্যে রয়েছে আস্ত একটি নরকঙ্কাল। তাছাড়া গোটা তিনেক মাথার খুলি।

অধ্যাপক নেলসন বললেন, এই নিবন্ত আগ্নেয়গিরির এক জায়গায় পেয়েছি। পলির-স্তরে।

জাহাজের কোন টুকরো টাকরা লক্ষ্য করেছেন, অধ্যাপক নেলসন?

কী বলতে চাইছেন? ভাবছেন দু চা'র বছরের মধ্যে ওই অঞ্চলে কোন জাহাজ ডুবি হয়েছিল। আর এই কঙ্কাল সেই জাহাজেরই কোন যাত্রীর, তাই না? হ্যাঁ, আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্যানবারায় আমার এক বন্ধু ডঃ ওয়েলচ-এর কাছে এগুলি পাঠিয়েছিলাম। ডঃ ওয়েলচ ক্যানবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়েশান ল্যাবোরেটারির সঙ্গে জড়িত। আমার অনুরোধে তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে তিনি এদের বয়েস মাপেন। মশায়, কী বলব। আমি তো তাজ্জব! কার্বন ১৪ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ডঃ ওয়েলচ কি সিদ্ধান্তে এসেছেন: জানেন? বলেছেন এগুলির বয়েস কম করেও হাজার বিশেক তো হবেই? তারও নাকি বেশি হতে পারে। ভাবুন তাহলে ব্যাপারখানা?

অধ্যাপক নেলসনের কথা শুনে দুটি যুক্তি আমি খাড়া করে বসলাম। এক, কুড়ি হাজার বছর আগে প্রাচীন কোন মানব জাতি হয়ত নৌকায় সমুদ্রের বুকে যাতায়াত করত। ওই সময় কোন দুর্ঘটনায় পড়ে নৌকাডুবি হয়ে সেই ডুবন্ত আগ্নেয়গিরির কাছে মারা পড়ে। ওই সমস্ত হাড়গোড় এবং কঙ্কাল তাদেরই দেহাবশেষ। দুই, এমনও হতে পারে এক সময়ে ওই আগ্নেয়গিরিটা ছিল একটি দ্বীপ। হয়ত সেই দ্বীপে ঘন বসতি ছিল। তারপর ভূতাত্ত্বিক কোন দুর্ঘটনা ঘটল। মানুষের বসতি নিয়ে দ্বীপটি সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেল। পরে ধীরে ধীরে সেই ধ্বংসাবশেষের উপর স্তরে স্তরে জমে ওঠে পলির স্তর।

আমার যুক্তির কথা অধ্যাপক নেলসনকে না বলে আমি পারলাম না।

জানি। বললেন অধ্যাপক নেলসন। তারপর বললেন, কুড়ি হাজার বছর আগের মানুষ নৌকা চালাতে পারত কী না, আমার জানা নেই। যদি পেরে থাকে, তাহলে আপনার প্রথম যুক্তিটা অসম্ভব নয়। কিন্তু, মশায়, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওই যে কী বললেন যেন, শেষের যুক্তিটা—হয়ত সেটাই আরও বাস্তব।

তার মানে? এবার আমার বিস্ময়ে ফেটে পড়ার পালা।

মানে আর কিছুই নয়। ডুবে যাওয়া আগ্নেয়গিরিটির কিছু পাথরের নমুনা নিয়ে, আমি পরীক্ষা করেছি। তাতে দেখা যাচ্ছে হাজার কুড়ি বছর আগে ওই পাহাড়টা সমুদ্রের উপরই মাথা উঁচিয়ে ছিল।

অসম্ভব নয়। আমার মন্তব্য।

অধ্যাপক নেলসন সব শেষে বারুদের স্তূপে যেন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরলেন।

তিনি বললেন, শুধু মাথা উচিয়ে নয়। জলের নিচে ডুব দিলে দেখতে পাবেন আগ্নেয়গিরিকে ঘিরে বসতির চিহ্ন। মানুষের মাথার খুলি, গুহামানবের চিহ্ন—মনে হয় এক সময়ে ওই দ্বীপে মানুষ বসবাস করতো।

ভাবুন একবার ব্যাপারটা, ডাঃ বাসু? গভীর রাতে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে যদি স্বপ্ন দেখেন আর ভোরে ঘুম ভাঙার পর সেই স্বপ্নে দেখা সমস্ত ঘটনা এই স্থূল দুটি চোখে বাস্তবে দেখতে পান, বলুন তো আপনার কী মনে হবে? ভাবছেন, এ কখনও হয়? স্বপ্ন স্বপ্নই তা কখনও সত্যি হয় নাকি?

বিশ্বাস করুন। আমার জীবনে সত্যিই তাই ঘটে গেল। অবশ্য স্বপ্ন বলতে যা বোঝায় আমি তা বলছি না। আসলে গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়া থেকে কেপ হর্ণ পর্যন্ত নানান নাম না জানা দ্বীপে ঘুরে আমার যে ধারণা হয়েছিল তাহলে সেটা কি সত্যি? সত্যিই কি এই সব দ্বীপে হাজার হাজার বছর আগে মানব সভ্যতা বিরাজ করতো? যেভাবেই হোক, তাদের মধ্যে পারস্পরিক যাতায়াতের ব্যবস্থাও কি তখন ছিল? অধ্যাপক নেলসন যা বললেন, যদি তা সত্যি হয়, বলতেই হবে, হয়ত আমি ভুল ভাবি নি।

হয়ত তাই। কারণ এর দুই দিন পর আমার বিশ্বাস ভঙ্গের জন্যে অধ্যাপক নেলসন তাঁর গবেষণা জাহাজে করে ওই জায়গাটায় আমাকে

নিয়ে যান। ওঁদের বেথোস্কোপ ছিল। জানেন নিশ্চয়, পুরু ইস্পাতের চাদরে তৈরী ডিমের মত এই ধরনের ক্যাপসিউলে চড়েই আজকাল সমুদ্রের নীচে ডুব দেবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এর ভেতর থাকে নানা রকম সাজ-সরঞ্জাম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন গ্যাস, নানান ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতি। যাক। বেথোস্কোপের বর্ণনা দিয়ে কাজ নেই। আসল ব্যাপারটা যা, তাই বলি।

আধ মাইলটাক নামতে আমাদের মিনিট দশেকের মত সময় লাগল। উত্তেজনায় আমার বুকের ভেতরটা তখন ধপ ধপ করে হাতুড়ি পেটা চলছে।

বিশ্বাস করুন ডঃ বাসু, তীব্র সন্ধানী আলো ফেলে ডঃ নেলসন এবং আমি গভীর সাগরের নীচে একটি ডুবো পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যা দেখলাম, সত্যিই যেন বিশ্বাস করা যায় না। না, রূপকথা উপকথার আটলান্টিস নয়। পাহাড়ের গা কেটে অদ্ভুত সব ঘরবাড়ি। একেবারে ভিন্ন রকমের। নানা রকম পশুর হাড়গোড়, নরকঙ্কাল, কুকুর, গরু এমন সব প্রাণীর হাড়ও সেখান থেকে আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। জাহাজডুবির ফলে এসবের ওইভাবে সমাবেশ অসম্ভব। পরে রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ওই সব সামগ্রীর বয়েস কম করেও কুড়ি হাজার বছর হবে।

এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসার পর মনের কী যে দারুণ অবস্থা, কী বলব? দিন পনের তো ঘুমতেই পারিনি।

এরপর প্রায় ছয়মাস ভারত এবং মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ ঘুরলাম। ওইসব অঞ্চলের প্রাচীনতম মানুষের কিছু কিছু ভাষা শিখলাম। ভাবলে অবাক হবেন, এমন কিছু কিছু জায়গা আমি দেখেছি, যেখানে আধুনিক সভ্যতার এতটুকু স্পর্শ আজও অজ্ঞাত। সেখানকার মানুষ এখনও জাহাজ দেখেনি, প্লেন দেখেনি। হাজার হাজার বছরে তথাকথিত সভ্য সমাজে যে বিপ্লব ঘটে গেছে, সে খবর কেউ তারা রাখে না।

হ্যাঁ, এই ম্যাপটা লক্ষ্য করুন। এই যে খুদে খুদে দ্বীপ, যাদের পাশ বরাবর লাল চিহ্ন এঁকে রেখেছি, এইসব অঞ্চলে ভালভাবে অনুসন্ধান চালালে পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলে মানব সভ্যতার বিস্তৃতির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস হয়ত আমরা খুঁজে পাবো।

এই বিশ্বাস নিয়েই পরবর্তী কার্যসূচীটি তৈরী করা হয়। যেটা সংক্ষেপে এই রকম: ক্যানবারা থেকে প্রায় পাঁচশ' মাইল দূরে গহন অরণ্যবাসীদের সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব পাতালাম। সেখান থেকে কয়েক জনকে সংগ্রহ করে শিক্ষিত করে তুললাম। মানে আমার কাজে কর্মে যাতে তাঁরা সাহায্য করতে পারে, এই আর কি? পনের জন। এই পনের জনের মধ্যে নেতা করলাম মঙ্গাকে, এবং শুভক্ষণ দেখে যত রকম সম্ভব সাজ সরঞ্জাম এবং খাবার নিয়ে একটি সদাগরি জাহাজে চড়ে আমরা যাত্রা করলাম ক্রোজেট দ্বীপের দিকে। ঠিক করা হলো আমরা প্রথমে ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে থামবো। সেখানকার কাজ শেষ করে পরে যা হয় করা যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রোজেটে আর পৌঁছান গেল না। ওই দ্বীপপুঞ্জের আমরা প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছি, আর মাত্র শ' দেড়েক মাইল দূরে, হঠাৎ সমুদ্রের বুকে নিম্নচাপ সৃষ্টি হল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল ঝড়। দমকা বাতাসে জাহাজটা যে অমন ঝপ্ করে উল্টে যাবে কে জানতো বলুন? ভাগ্য ভাল, তখন দিন। সূর্যের আলোয় আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছি।

শুরু হলো হৈ চৈ। জাহাজ থেকে লাইফ বোট নামিয়ে দেওয়া হল। মঙ্গা এবং তার দলকে নিয়ে জবরদস্ত কোন রকমে একটি বোট জোগাড় করে নেমে পড়লাম সমুদ্রের বুকে। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎকে সম্বল করে।

এই সময়ে আমার সঙ্গে পরিচয় হয় ডঃ নিগুচির। সৌভাগ্য বশতঃ তিনিও ওই জাহাজের সোয়ারি হয়ে সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন। শুধু পাড়ি দেওয়া বললে ভুল হবে। আসলে জাহাজে বসে দক্ষিণ

অঞ্চলের চৌম্বক ক্ষেত্র নিয়ে কী যেন একটা গবেষণা চালাচ্ছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে জাহাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জাপান আবহাওয়া বজ্ঞানী পরিষদের একটা চুক্তি হয়ে ছিল।

পরিচয়টা নাটকীয়ভাবেই ঘটলো।

বোট নামিয়ে কোন রকমে নিজেদের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করে বোটে বোঝাই করে সবে যখন আমরা নিরাপদ কোন জায়গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো, ঠিক সেই সময় জাহাজের ডেকের ওপর থেকে মনে হল কে যেন ছিটকে আমাদের পাশেই জলে এসে পড়লো। মঙ্গা অপূর্ব কৌশলে তাঁকে উদ্ধার করে তুললো আমাদের বোটে। বোটে ওঠার পর প্রথম দশ মিনিট তিনি কোন কথাই বলতে পারেন নি। তারপর হাঁউমাউ করে সে কী তাঁর কান্না?

পাশে বসা ডঃ নিগুচির দিকে চেয়ে ডঃ রামচন্দ্রন একটু মুচকি হাসলেন। তারপর আবার শুরু করলেন।

ইনিই ডঃ নিগুচি। তিনি বললেন, সারা জীবনের সমস্ত গবেষণার ফলাফলই ওই জাহাজে পড়ে রইলো। তিনি উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ উমদো মুখো একজন জাহাজকর্মী এসে এমন ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিলো—তাল সামলানো দায়! যতই বলি, আমার গবেষণার কাগজপত্র, যন্ত্রপাতি এসব তো নিতে দাও। লোকটি যেন ক্ষেপে গেল আমার ওপর। বলল, যাচ্ছ তো দরিয়ার নরকে। মরার পর ওগুলি কি সঙ্গে যাবে? মশায়, এমন ছুটোপুটি শুরু করল, ওর ধাক্কাতেই আমি জলে পড়ে গেলাম। ভাগ্য ভাল ডঃ রামচন্দ্রের বোটের কাছে পড়েছিলাম। আর কারোর বোটের কাছে পড়লে বৈঠার বাঁট মাথায় বসিয়ে দিতো। ওই অবস্থায় আর একজনকে নিয়ে কে আর বোটের ওজন বাড়াতে চায়, বলুন?

বিপদ এলো এর পর। বলতে লাগলেন ডঃ রামচন্দ্রন। ঝড়। তার সঙ্গে নামলো বৃষ্টি। হঠাৎ কী যেন একটি স্রোতের মুখে পড়ল বোট। জানেন তো সমুদ্রে কত রকমের স্রোত আনাগোনা করে?

মঙ্গার তো মুখ শুকিয়ে গেছে।

কী ব্যাপার? আমি প্রশ্ন করলাম।

আমরা ফ্যাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ছোট্ট একটি উত্তর দিলো সে।

তার মানে?

মঙ্গা কোন কথা বলল না। নিজের ঝোলা খুলে কী যেন বের করার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে তার সঙ্গীরাও।

ডঃ নিগুচি এবং আমার তখন প্রায় শীতে জমে যাওয়ার মত অবস্থা।

মঙ্গা তার ঝোলা থেকে কতকগুলি শেকড় বের করল। কী গাছের শেকড় জানি না। এক থাবা করে ওই শেকড় আমাদের হাতে দিয়ে বলল, এখনই চিবিয়ে খেতে শুরু করুন। শীতে অস্বস্তি লাগলেই এই শেকড় খাবেন। ঠাণ্ডা লাগাবে না।

তারপর সঙ্গীদের নিয়ে সে নৌকা চালাতে বসলো।

শুরু হল দীর্ঘ যাত্রা। একটানা সমুদ্র। আর কোন মানুষের সাক্ষাৎ নেই। এ আমরা কোথায় চলেছি? জানি না কেন, হঠাৎ ডঃ নিগুচি এবং আমি কেমন যেন চুপ মেরে গেছি। বলতে কি কেউ কারোর সঙ্গে কথাই বলছি না। খাবার সময় খাচ্ছি। তারপর উদাস নয়নে শুধু প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকা। আর ঘুমনো। মঙ্গা পরে বলছিলো, ওটা ওই শেকড়ের গুণ। শেকড় আমাদের মনে একটা আবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল। পরে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি আরও একটি মস্ত গুণ ওই শেকড়ের। ওই শেকড় পরিবেশের সঙ্গে শরীরকে তাল রেখে চলতে সাহায্য করে। অর্থাৎ আপনি যদি ওই শেকড় খান, মনে করুন, তারপর আপনি মরুভূমিতে বিচরণ করছেন। বুঝতেই পারছেন মরুভূমির তাপমাত্রা শরীরের তাপমাত্রা থেকে অনেক বেশি। কিন্তু ওই শেকড় খেলে দেখবেন, যেই মরুভূমির তাপমাত্রা বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আপনার শরীরেও তাপমাত্রা বাড়বে।

তখন আপনার শরীরের তাপমাত্রা এবং পরিবেশের তাপমাত্রা সমান হওয়ায় আপনার আর গরম লাগবে না। তেমনি ঠাণ্ডা জায়গায় গেলে, আপনার শরীরও ঠাণ্ডা হতে থাকবে। তখন আপনি আর শীত অনুভব করতে পারবেন না।

একটানা দশদিন একটা অদ্ভুত আবেশের মধ্যে কাটানোর পর সমস্ত অনুভূতিই যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আবছা যেটুকু মনে আছে সেটুকু এই। আমরা জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি। দিনে আবছা আলো। মানে গাঢ় অন্ধকারের পালাটা যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। না আলো না অন্ধকার এমন একটি জগতের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। শেষের দিকে মনে হল বড় বড় বরফের চাঁই যেন আশপাশে বিচরণ করছে। অদ্ভুত নৈশব্দ চারদিকে। আবার তারই ফাঁকে যেন হাজারো মেঘের গর্জন। সেই শব্দ বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।

সঙ্গে তখনও পর্যন্ত আমাদের যথেষ্ট খাবার। তবে মঙ্গা এবং তার দলবল মনে হলো আমাদের সভ্য খাবার কম খাচ্ছে। বরং সমুদ্র থেকে নানা জাতের মাছ ধরে তাদের বনভোজনের মোচ্ছব চলেছে যেন। তার দু এক টুকরো আমরাও খাচ্ছি অবশ্য।

আরও দশদিন কাটল এর পর। কঠিন পাহাড়ের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। বিস্তৃত স্থলভাগও। কিন্তু কোন বনজঙ্গল বা বড় গাছপালার চিহ্নমাত্রও নেই। কিছু শেওলা বা ওইরকম কিছু উদ্ভিদ চোখে পড়ল। আমাদের নৌকাটি একটি খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এবং এই ভাবে চলতে চলতে একদিন মঙ্গা নৌকোটিকে এক জায়গায় নোঙর করল।

এসে গেছি আমরা, হাসতে হাসতে বলল সে। বলল, আর বিপদ নেই। এবার হেঁটে স্থলপথ দিয়েই আমরা আরও পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। অবশ্য নৌকোটি বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ শেষের দিকে কয়েক মাইল আবার নৌকো চাপতে হতে পারে।

বলেই পাশেই মঙ্গার দলের একজন প্রবীণকে কী যেন জিজ্ঞাসা করল সে।

লোকটি কিছুক্ষণ ধরে কী ভাবল। একবার আকাশের দিকে চাইলো। একবার ঘুরপাক খেল। তারপর ডান হাতের চেটোর উপর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল রেখে কয়েকটি জায়গায় কী যেন দেখলো। ঠিক গণৎকাররা যেভাবে হাত দেখে কতকটা সেই রকম করে। তারপর আবার খানিকটা চিন্তা। আবার ঘুরপাক। এবং অবশেষে বলল, হ্যাঁ, ওই রকমই তো মনে হচ্ছে।

ডঃ নিগুচি এতক্ষণ কী যেন দেখছিলেন চারপাশে। দেখতে দেখতে প্রায় হাজার খানেক গজ দূরেই চলে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, বায়ার্ড! আমরা নির্ঘাৎ বায়ার্ড উপদ্বীপে এসেছি, ডঃ রামচন্দ্রন।

বায়ার্ড? বলেন কি আপনি? সে তো রাক্ষসের মুখ। আমি এক্ষুনি মূর্ছা যাব নির্ঘাৎ। সত্যিই আমার মূর্ছা যাবার মতই অবস্থা হলো।

বলেন কি, ডঃ নিগুচি? তাহলে এখন আমরা দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। আর এখনও আমরা বেঁচে আছি?

তাই তো দেখছি? বললেন ডঃ নিগুচি। কী করে এটা সম্ভব?

এত শীতে আমরা জমে যাচ্ছি না। তার চেয়েও বড় কথা, বাড়ি ফিরবো কী করে?

মঙ্গা বললো, কোন ভয় নেই। ওই শেকড়ই আপনাদের বাঁচিয়ে রাখবে। তারপর সেই প্রবীণ লোকটিকে ডেকে বলল, কী মনে হচ্ছে—? ভুল হয়েছে কিছু?

লোকটি তখনও পর্যন্ত একবার করে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং একবার করে ডান হাতের চেটোর উপর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল বুলিয়ে চলেছিল। মঙ্গার কথায় সে ভারিক্কি চালে একবার মাথা দোলালো।

যাক। তাহলে ভয়ের কারণ নেই। পথ চিনে আমরা চলতে পারবো। বলল মঙ্গা।

কথাটা শুনে কেমন অদ্ভুত লাগলো আমার।

মঙ্গা বললো, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের কাছ থেকে এসব আমাদের অনেকেই জানে। আমাদের বাপ-ঠাকুরর্দারা শুনেছিলো তাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের কাছ থেকে। এইভাবে কত দিন ধরে চলে আসছে, কেউ জানে না। সেই পুরনো আমল থেকে, ভগবান যখন মানুষ তৈরি করল না? ঠিক তারপর থেকে। ভগবান মানুষ তৈরি করে এদিকের নানান দ্বীপে পাঠিয়ে দিলো। এই যে এখানে, এখন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, এখানে নাকি আগে তেমন বরফ ছিল না। এখানে বড় বড় গ্রাম তৈরি করে মানুষ বাস করতো। ওই যে পাহাড়গুলি দেখছো, সার সার দাঁড়িয়ে, ওদেরই পাশ দিয়ে একফালি রাস্তা সোজা পশ্চিমে চলে যায় শেষের দিকে।

কেন? মঙ্গার বক্তৃতায় জোর করেই বাধা দিলাম আমি।

যাবে না? মঙ্গা যেন অবাক হল আমার এই প্রশ্নে। বললো পৃথিবীটা হঠাৎ উলটে গেল যে। উত্তরের যত জল এসে জমলো দক্ষিণে। কত গ্রাম ডুবে গেল। প্রাণের ভয়ে মানুষ তখন ছুটে চললো পশ্চিমের পথ ধরে। তবে অনেকেই মারা যায়। হাজার হাজার বছরে এখানটা বরফে ঢেকে গেল। কে আর এমন জায়গায় বাস করবে, তুমিই বল ডাক্তার রাম? শুনেছি টুপটাপ অনেক দ্বীপও কেমন করে যেন সমুদ্রে তলিয়ে গেছে অনেক গ্রাম সমেত। নইলে এদিক পানে আগে তো নৌকায় চড়ে লোক আসতো?

কে বলেছে এসব কথা তোমাকে? আমার প্রশ্ন।

আমার বাপ-ঠাকুর্দা, আবার কে? মঙ্গার চট্‌পট্‌ উত্তর।

অ—!

বিশ্বাস হল না বুঝি?

না, মানে—?

মানে আর কি ? এতো এদেশের সবাই জানে। তবে আমার মত অনেকেরই মাথা প্রায় নিরেট কিনা ? আমরা মনে রাখতে পারি না। হাজার হাজার বছর ধরে এসব কথা আমাদের পুরনো আমলের মানুষরা তাদের ছেলেপুলেদের শুনিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে তু' চারজন সে সব কথা মনে রাখে শুধু। ওই যে গাংগো। ও সব জানে। শুনেছি, যখন ওর বয়েস কম ছিল, কয়েকবার এদিকে ঘুরে গেছে। পেংগুইন পাখি আর কী সব জন্তু জানোয়ার ধরতে এসেছিল।

সঙ্গে তিনটে তাঁবু ছিলো। সেগুলি খাটান হলো। আপাতত বিশ্রাম। মঙ্গা খাওয়া দাওয়ার পর আরও একটা কি শেকড় খেতে দিলো। বললো, খুব সামান্য খাবেন। ঘুম হবে। শরীর চাঙ্গা হবে।

সেই শেকড় খাবার পর সত্যিই প্রচণ্ড ঘুমিয়ে নিলাম, কম করেও চব্বিশ ঘণ্টা। ঘুম ভাঙ্গার পর মনে হল, শরীর অনেকটা ঝর ঝরে হয়ে উঠেছে। স্ফূর্তি বোধ করছি।

ডঃ নিগুচি কিন্তু সব সময় গম্ভীরই হয়ে রইলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, এত চুপচাপ কেন ডঃ নিগুচি ?

নিগুচি আমার দিকে চাইলেন। তাঁর সে দৃষ্টি কোনদিনই আমি ভুলবো না ডঃ বাসু। একজন মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট আত্মীয় যদি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, বলুন ডাক্তার এখন একে কিছু খাবার দিতে পারি তো ? এ কথা শুনে ডাক্তারের মুখের চেহারাটা যেমন দাঁড়ায়, ডঃ নিগুচির মুখের চেহারাও আমার কাছে মনে হলো যেন তেমনই।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, গত বছরই এখানে আমি কাটিয়ে গেছি, ডঃ রামচন্দ্রন। বায়ার্ডকে আপনি চেনেন না। একটি আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম এখানকার আবহাওয়ার ওপর গবেষণা চালাতে। শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে সবাইকে পালাতে হয়। উঃ ! ঠিক রাত তিনটে। ব্যাপারটা সব সময় ঠিক তিনটের সময়ই ঘটেছে। শব্দ ! মশায়, সে শব্দের কোন তুলনা নেই। তু'জন লোক আমাদের তো মারাই গেল সেবার ?

বলছেন কি আপনি ডঃ নিগুচি? আমার প্রশ্ন।

ঠিক বলেছি। তাছাড়া, আপনি জানেন না, কী রাক্ষুসে এই বায়ার্ড! এখানকার তাপমাত্রা মাঝে মাঝে শূন্যেরও সত্তর ডিগ্রি নিচে পর্যন্ত নেমে যায়। তার সঙ্গে চলে ঝড়। সেই ঝড়ের গতি কখনও কখনও ঘণ্টায় তিন শ' কিলোমিটারের মত গিয়ে দাঁড়ায়। আর বাতাস? সাহারা মরুভূমির চেয়েও শুকনো। তাতে এতটুকু জলীয় বাষ্প নেই। ঠিক সেই পরিবেশে ঠিক রাত তিনটেয় সেই শব্দ! জানি না এখান থেকে কী ভাবে আমরা মুক্তি পাবো। বিশেষ করে এবারকার যা অবস্থা। কোন আধুনিক ব্যবস্থা নেই। দুর্ঘটনায় পড়ে নিদারুণ অসহায়ের মত এখানে আমরা হাজির হয়েছি। ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জে জাহাজ ডুবিতে সঙ্গে আবহাওয়া মাপার যা কিছু যন্ত্রপাতি ছিল তাও খুইয়ে এলাম।

ডঃ নিগুচি যা বললেন তার এক বর্ণও আমি বুঝতে পারি নি। শুনলাম শুধু। অজানা ভয়ে খানিকটা শঙ্কিত যে হলাম না, সে কথা বলব না। কিন্তু আসল ব্যাপারটাই বা কী?

ডঃ বাসু, ডঃ নিগুচির কথায় যেমন শঙ্কিত হয়েছিলাম, ঠিক তেমনি মঙ্গার কাছে যা শুনলাম তাতে তো আমার নাচ শুরু করে দেবার মত অবস্থা।

মঙ্গা আমাকে কী বললো জানেন?

পরদিন নিভৃতে ডেকে সে আমাকে বলল, ডাক্তার রাম, ভয়ের কোন কারণ নেই। এ সব পথঘাট আমাদের জানা। ওই যে, গাংগোকে দেখছেন না? আমাদের মধ্যে যে বেশি বয়স্ক?

দেখছি। তিনদিন ধরেই তো দেখছি ওকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর হাতের চেটোয় করকোষ্ঠি দেখছে। আমার কণ্ঠে হতাশা।

বলছো কি তুমি, ডাক্তার রাম? গাংগোই তো আমাদের এখন অবলম্বন। ও বলছে, আসল রাস্তাটা এতক্ষণ ও জেনে ফেলেছে।

কতকগুলি কবরের পাশ দিয়ে আমাদের হেঁটে যেতে হবে। আর কিছু কিছু পাহাড়। এ কয়দিন তাদের নিশানার কথাই সে ভাবছিলো। তাদের আবিষ্কার করার চেষ্টায় ছিল।

অদ্ভুত গল্প। গল্পের মতই মনে হয়। কিন্তু মঙ্গোরা বিশ্বাস করে এসব কাহিনী। ওদের অনেকেই এসব খবর রাখে না। রাখে মাত্র এক-আধজন। যারা গাংগোর মত প্রবীণ।

মুহূর্তে পুরনো বিশ্বাসটা আমার চাড়া দিয়ে উঠলো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও একটা কথা শুধু ভাবতে লাগলাম, কী করেই বা মঙ্গোর গল্প উড়িয়ে দেওয়া যায়? কারণ, একটা কিছু নিশ্চয় তারা জানে। নইলে আমরা এই আধুনিক বিজ্ঞানের মানুষ হয়ে দক্ষিণ মেরু ঘোরার জন্যে কত আয়োজনই না করছি? বিশেষ ধরনের পোশাক, যানবাহন, ব্যবস্থা—? তবু কত ভয়। কিন্তু ভাবুন, এদের সে সব চিন্তা নেই। শেকড় খাইয়ে শরীরের তাপমাত্রার মধ্যে ভারসাম্য রাখা, এ সব তো নিজেই দেখলাম। তারপর গাংগো যা বলছে, নিশ্চয় ওর নির্দেশিত পথ ধরে গেলে কোথাও না কোথাও আমরা উপস্থিত হবই, এ বিশ্বাস ক্রমেই যেন আমাকে গ্রাস করে ফেললো। অদ্ভুত এই, এখানকার পরিবেশে ওরা কেউই কোনদিন আসে নি। শুধু পূর্বপুরুষদের কথা মনে রেখে আসছে। বিশ্বাস করে আসছে। আর তার ওপর নির্ভর করেই ওরা ভিন দেশে যাওয়ার পথ খুঁজছে।

আমার মনে একটা পুরনো প্রশ্ন আবার জোরাল হয়ে উঠলো। তাহলে এটা কি ঠিক, আধুনিক মানুষের ইতিহাস নাগাল পায়নি এমন কোন মানব সভ্যতা হাজার পনের অথবা তারও আরও কয়েক হাজার আগে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ মেরুর কাছ বরাবর? পরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সেই সভ্যতা ক্রমে আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, ভারতের দক্ষিণে এবং অবশেষে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ওই

সময় দক্ষিণ মেরুর বহু জায়গা হয়ত এখনকার মত বরফে ঢাকা ছিল না।

কথাটা ডঃ নিগুচিকে বললাম।

আমার কথা শুনে মনে হল ডঃ নিগুচি হাসবেন কি কাঁদবেন যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কিছুক্ষণ একটানা আমার দিকে চেয়ে বললেন, যা ভেবেছিলাম, এখন দেখছি তাই হলো। আপনারও দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী পাগলের মত বকছেন সব? মেরু অঞ্চলের ঠাণ্ডা এবং একঘেয়েমিতা কখনও সখনও মানুষের মাথা খারাপ করে দেয়, জানি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যা শুনেছিলাম তা মিথ্যে নয়।

ভাবুন একবার ব্যাপারটা! ডঃ নিগুচিও আমাকে পাগল বললেন?

তবু বললাম, গাংগো আমাদের বাঁচিয়ে পথ করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে বলেছে।

সে দিনটা খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে গেল। ডঃ নিগুচির কথা আমাকেও যে খানিকটা ভাবিত করে তুলছিল না, সে কথা বলবো না। তবে ওদের ওই শিকড়ের গুণ এবং এমন একটি বিপদ সঙ্কুল পরিবেশে অমন মনোবল দেখে বিশ্বাসও হারালাম না।

এইভাবে আরও দু'দিন অতিক্রান্ত হলো। আর তার পর ডঃ নিগুচি যা আশঙ্কা করলেন, তাই হয়ে গেল। ডাঃ বাসু, সে এক দারুণ দুঃস্বপ্ন! কোথা থেকে কী হয়ে গেল আমি বলতে পারবো না। রাতের দিকে ঘুমটা আমার কমই হতো। সেদিন রাতে মেঝের উপর আমাকে টেনে নিয়ে ডঃ নাগুচি বললেন, মুখে কাপড় গুঁজে উবু হয়ে শিগ্‌গিরি শুয়ে পড়ুন, ডঃ রামচন্দ্রন। আর বুঝি নিস্তার নেই।

কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। বোঝার সময়ও আমাকে দিলেন না। ওঁর আদেশ পালন করলাম সঙ্গে সঙ্গে।

আর তারপর! কী বলব। শব্দ! অমন শব্দ জীবনে শুনি নি, মশায়। সেই সঙ্গে ঝড়। কী তার তোড়!

ডঃ নিগুচি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ। প্রায় আধ ঘণ্টা ওইভাবে শুয়ে থাকার পর মনে হলো ঝড় কমে গেছে। আমার হাত ঘড়িতে তখন রাত তিনটে।

তাহলে এর কথাই কি ডঃ নিগুচি আমাকে বলেছিলেন। এই ঝড়ের ভয়ই কি করছিলেন তিনি? শব্দটা কিসের?

ডঃ নিগুচি? ডাক দিলাম আমি।

কোন সাড়া পেলাম না।

ডঃ নিগুচি! আবার ডাকলাম।

এবারও কোন সাড়া নেই।

ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে তুললাম। দেখলাম তিনি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন।

ওদিকে বাইরে হুলস্থূল কাণ্ড।

মঙ্গা ছুটে এসে জানালো, তাদের পাঁচজন মানুষ শব্দে মারা পড়েছে।

মঙ্গার পেছনেই এল গাংগো! সে আমাদের ভাষা এখনও রপ্ত করতে পারে নি। নিজেদের ভাষাতেই কী যেন বলল সে।

মঙ্গা তার অনুবাদ করে দিলো। এমনটা যে ঘটবে গাংগো জানতো। সে আগেই বুঝেছিল। তবে এখন আর দেরি নয়। কাল এই সময়ে এমনি ধারা আবার হবে। তখন আবার কার কাঁধে মৃত্যু ঝুলবে, কে জানে? গাংগো বলছে, এখানে এক মুহূর্ত আর থাকা নয়। আকাশে গোধূলির মত যে আলোটুকু আছে, তাতেই পথ চিনে চলা যাবে।

একবার চাইলাম ডঃ নিগুচির দিকে। তখনও তিনি অজ্ঞান।

ভাবলাম, ভালই হলো। নইলে এমন একটি ঝক্কি নিতে যাচ্ছি দেখে হয়ত বাধাই দিতেন তিনি।

কথা নয়, এবার শুরু হল দুর্গম যাত্রা। কখনও নৌকায়, কখনও বেশির ভাগ হেঁটে। পথ প্রদর্শক এবার গাংগো।

পথের বর্ণনা দিয়ে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না, ডঃ বাসু। বরং যদি সুযোগ ঘটে, আপনি নিজেই বরং তা প্রত্যক্ষ করবেন. তবে দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমরা বেঁচে আছি। দীর্ঘ দুই মাস পথ চলার পর আমরা একদিন কেপ হর্ণ-এ এসে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে রিও দ্য জেনেরিও হয়ে ক্যারাক্কাস। তারপর হনুলুলু।

হনুলুলুতে এই ঘটনার একটি বিশদ বিবরণ বের করি সেখানকার একটি খবরের কাগজে।

আর তার পরদিন আমেরিকান প্রকৃতি বিজ্ঞান পরিষদের একটি বিবৃতি বের হয়। তাতে বলা হলো, এই প্রথম মানব ইতিহাসের সব-চাইতে আজগুবি গল্প প্রথম নাকি তাঁরা শুনলেন। গল্প যে কত বেশি উদ্ভট হতে পারে আমাদের কাহিনীটি নাকি তার একটি আদর্শ উদাহরণ।

ব্যাস। এর পর আর কাকে কী বলব, বলুন?

তবু চেষ্টা করেছি ইউরোপে এসে দু' চার জনকে বিশ্বাস করাতে। আমেরিকানরা এমনিতেই একটু ভাবে কম। আর যা পছন্দ করে না, এত স্বচ্ছন্দে তার বিরুদ্ধে বলে ফেলে যে, ওদের সংগে গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বলাই দায়। এদিক দিয়ে ইউরোপের লোকগুলির ওপর আমার একটা বিশ্বাস ছিলো। ওরা মুখের ওপর দমাস করে কোন সিদ্ধান্ত টানে না। কিন্তু সেখানেও দেখলাম, সব ছাগলের এক রা। একজন তো বলেই বসলেন, কী বললেন, আপনারা বায়ার্ড থেকে ফিরছেন? পায়ে হেঁটে? আগে বলুন, আপনারা মানুষ নয়, মানুষেরই প্রেতাত্মা, তাহলে বিশ্বাস করলেও করতে পারি।

অতএব চেষ্টা বৃথা।

কিন্তু আমি শেষবারের মত চেষ্টা করবো। আমার প্রস্তাব, এক কাজে আপনি আমাদের সাহায্য করুন, ডঃ বাসু। আপনার সাহায্য পেলে আসল সত্য আমি আবিষ্কার করতে পারবো, এ আমি আপনাকে বলে রাখছি।

একটানা কথা বলার পর থামলেন ডঃ রামচন্দ্রন। একমাত্র বক্তা ডঃ রামচন্দ্রন আর নিগুচি এবং আমার ভূমিকা শ্রোতার। মাঝে মাঝে দু একটা হুঁ হাঁ ছাড়া ডঃ রামচন্দ্রনের কথায় বলতে কি, কেউই আমরা বাধা দিই নি। স্টাডির নীরবতাকে কথাটা আমরা ভুলে গেছি ডঃ রামচন্দ্রন মনে প্রাণে এখনও পর্যন্ত যে যুগের মধ্যে বিচরণ করছেন, তা থেকে পৃথিবীটা যে কম করেও আরও কুড়ি হাজার বছর বুড়িয়ে গেছে, সে কথাও আমরা যেন বিস্মৃত প্রায়। ঘরের কোণে একটি আলমারির ওপর চোখ পড়ল হঠাৎ। তার ভেতরে নজরে পড়ল খান তিনেক কুমেরু সম্পর্কিত বই। মনে মনে ভাবলাম, ভাই, তোমরা এখন সব মিথ্যে হবার জোগাড়। ডঃ রামচন্দ্রন যা বললেন, তারপর তোমাদের পাতায় যা টোকা আছে, সে সব এখন মামুলি হয়ে যাবে।

ডঃ নিগুচির দিকে চাইলাম। কোন কিছুতে প্রচণ্ড অবিশ্বাসের পর একটা মানুষ যখন তাকেই আবার বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় তখন তার মুখে অদ্ভুত যে চেহারা ফুটে ওঠে, জাপানী বিজ্ঞানী ডঃ নিগুচিরও এখন সেই অবস্থা। গল্পের শেষে কিছুক্ষণ আমার কাটলো সমাধিস্থ অবস্থায়। তারপর প্রথম যাঁর ওপর চোখ গিয়ে পড়লো, তিনি ডঃ নিগুচি। পরস্পরের দিকে চেয়ে আমরা মৃদু হাসলাম।

তারপর আবার কয়েক মিনিটের জন্যে বিরতির পর বললাম, রাত প্রায় সাড়ে আটটা। ডঃ রামচন্দ্রন এবং ডঃ নিগুচি, এত রাতে হোটেলে ফিরে ডিনার সারার চেয়ে ব্যাপারটা এই গরীব খানায় সেরে গেলে আপনাদের আপত্তি আছে?

আবার ওসব কেন? ডঃ রামচন্দ্রন কিন্তু কিন্তু করলেন।

না, আপনাদের একটু অসুবিধে হবে হয়তো, আমার তো সংসার

ছু'জনকে নিয়ে। মদন আর আমি। মোটামুটি সব প্রস্তুতই আছে আমার কোন অসুবিধে হবে না। খাবার সময় এর পরের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাবে, তাই না?

আমার কথায় ওঁরা দু'জনেই সম্মত হলেন। আমি মদনকে ডেকে খাবার ব্যবস্থা করতে বললাম।

ডঃ নিগুচি বললেন, পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে পুরো ঘটনাটাই আমার কাছে অকল্পনীয় অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল, ডঃ বাসু! কিন্তু সব দেখে শুনে আমার চোখ এখন তো কপালে!

কোন ঘটনার কথা বলছেন? আমার প্রশ্ন।

অত শীতে, অত কম শীতের পোশাকে এবং আধুনিক সাজ সরঞ্জাম ছাড়া বায়ার্ড থেকে কী করে আমরা বেঁচে এলাম? জায়গাটা যে কী সাংঘাতিক সে তো আপনিও জানেন।

জানি। আপনি একথা নিশ্চয় জানেন ডঃ নিগুচি জৈবিক পদ্ধতিতে আমাদের শরীরে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের একটা সুন্দর ব্যবস্থা আছে। খাবারের মধ্যে দিয়ে যে শক্তি আমরা নিই, যাকে জ্বালানি বলা হয়, শরীরে গিয়ে তারাই তো আমাদের তাপ দেয়। কিন্তু কখনও দেখেছেন কি, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের একজন মানুষের শরীরের তাপমাত্রা ৯৭-৯৮ এর বেশি ওঠা নামা করে? এর কারণ ওই থার্মোস্ট্যাট ব্যবস্থায় শরীরের তাপমাত্রা সব সময় একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা হয়। অবশ্য একথা মানুষের মত জীবের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু মরুভূমিতে উটের কথা ভাবুন? মরুভূমিতে সকালে ঠাণ্ডা, দুপুরে বেজায় গরম। আবার রাতে প্রচণ্ড শীত। তাই তাদের শরীরে এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে যে, যখন বাইরের তাপমাত্রা বাড়ে তাদের শরীরেরও তাপমাত্রা বেড়ে যায়। আবার মরুভূমির তাপমাত্রা কমলে তাদের নিজেদেরও তাপমাত্রা কমে। ফলে উটদেরও শরীরের তাপমাত্রা থেকে তার পরিবেশের তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকে। এর জন্যে উটদের খুব

একটা কষ্ট হয় না। সাপের বেলাতেও এ কথাটা খাটে। কিন্তু মানুষের বেলায় খাটে না। ডঃ রামচন্দ্রনের কথা শুনে আমার মনে হয়েছে বায়ার্ডে ওই আদিবাসীরা যে শেকড় আপনাদের খেতে দিয়েছিলো নিশ্চয় তার এমন একটি গুণ আছে যা মানুষের শরীরের তাপমাত্রা উটদের শরীরের মতই কমাতে বাড়াতে পারে। এর জন্যেই মেরুর শীত হয়ত আপনাদের ক্ষতি করতে পারে নি। ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, এ থেকে একটা সিদ্ধান্তে কি আমরা পৌঁছতে পারি না, ডঃ বাসু, যে প্রচণ্ড শীতে কী ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় গাংগো এবং মাঙ্গো তাহলে সেটা তারা জানে?

নিশ্চয়। আমার উত্তর। এ ধরনের উদাহরণ পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই পাবেন। দেখুন না, লাটিন আমেরিকা ও ভারতেও যাদের আমরা আদিবাসী বলি, নিজের রোগ সারাবার জন্যে মাঝে মাঝে ওরা এমন সব গাছগাছড়া ব্যবহার করে যাদের আমরা চিনি না, খবরও রাখি না। লাটিন আমেরিকায় র‍্যাটেল সাপের হাড়ের গুঁড়ো দুধের সঙ্গে খাইয়ে হাঁপানি সারায় শুনেছি।

না, আমি সে কথা বলি নি। বললেন ডঃ রামচন্দ্রন, হয়ত মেরুর হিমশীতল অঞ্চলে মাঝে মাঝে ওরা যাতায়াত করে বলেই ওই শেকড় সম্পর্কে তারা খবর রাখে।

ডঃ নিগুচি বললেন, আমার বিশ্বাস হয় না। অন্ততঃ বায়ার্ড অঞ্চলে একাদিক্রমে এক বছর আমাকে থাকতে হয়েছিল। আমরা তখন মেরুজ্যোতির উপর গবেষণা চালাচ্ছিলাম। ওই এক বছরে কোন আদিবাসীকেই আমরা ওই অঞ্চলে দেখি নি। ডঃ বাসু, আপনিও তো বায়ার্ডে ছিলেন বেশ কিছুদিন। আপনি কি কখনও দেখেছেন?

না।

আমি কিন্তু সে কথা বলছি না। ডঃ রামচন্দ্রন মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, মঙ্গার সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়েছিল। সে বলেছে,

এর আগে ওই অঞ্চলে তারা কেউ কোনদিন আসে নি। তবে হাজার হাজার বছর আগে ওদের পূর্বপুরুষরা আসতো। তারাই ওই অঞ্চলের বর্ণনা, কী ভাবে কোন পথে সেখানে যেতে হয়, কী কী সাবধানতা নিতে হয়, জানতো। মৃত্যুর আগে তারা সে সব খবর তাদের কোন কোন ছেলেমেয়েদের বলে যায়। সেই সব ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে পরবর্তী বংশধরে ওই খবর চলে আসতো। এক সময়ে ভারতে যেভাবে কথা শুনে শুনে মানুষ পূর্বপুরুষদের কথা মনে রাখত ব্যাপারটা সেই রকনই।

স্ট্রেঞ্জ। মন্তব্য করলেন ডঃ নিগুচি। এসব গোপন খবর আমাদের প্রাচীন পুরোহিতদের মত তাহলে ওদের মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল বলুন।

মঙ্গার কথা শুনে তাইতো মনে হয়। তবে সকলেই সে সব জানতে পারত না। জানত বিশেষ বংশের ছেলেরা। গাংগো তাদেরই একজন।

ডঃ রামচন্দ্রন সত্যিই যেন সেখানকার প্রাচীনতম সভ্যতা সম্পর্কে একেবারে পুরোপুরি বিশ্বাসটাই ধরে রয়েছেন।

মাঝপথে তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, তা না হয় হলো। সেটা আনন্দ পরে দেখবো। যে কথাটা এখন আমার মাথায় উঁকি মারছে সেটা হলো, ওই যে কী একটা শব্দের কথা বললেন না? সে সম্পর্কে কিছুটা অনুমান আমি অবশ্য করতে পারছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার মাথাটাও কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, ডঃ রামচন্দ্রন।

কী ব্যাপার? ডঃ রামচন্দ্রনের প্রশ্ন।

আপনি ওই যে কী একটা শব্দের কথা বলছিলেন না। আমার আগ্রহ সেখানেই বেশি। প্রশ্ন এই, কী এমন শব্দ হল যাতে করে আপনাদের পাঁচ পাঁচটি প্রাণ হারাতে হলো। এবং ডঃ নিগুচি অমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন?

আমার কথা শুনে ডঃ নিগুচি বললেন, এটা তেমন কিছু শক্ত

ব্যাপার নয় ডঃ বাসু। পোলার নয়েজের ব্যাপারটা তো আপনি জানেন?

জানি। মেরু অঞ্চলে শুকনো বরফের পারস্পরিক সংঘর্ষে যে শব্দ হয় সেই শব্দই মসৃণ বরফের পাহাড়ে প্রতিফলিত হয়ে বাজের মত শব্দ করে জানি। এছাড়াও মেরু অঞ্চলে অদ্ভুত চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে সেখানকার বিদ্যুৎ তরঙ্গের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দরুণও এক ধরনের বেতার শব্দ হতে পারে বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন।

এ কথাও জানি। আসলে এই শব্দ নিয়েই সেবার আমরাও কিছু কিছু কাজ করেছিলাম। কিন্তু প্রশ্ন এই, এই শব্দের সঙ্গে ওই সময়ের কি সম্পর্ক?

সময় মানে?

মানে ওই যে আপনারা বললেন না, যতবারই এই শব্দ আপনারা শুনেছেন, শুনেছেন ঠিক রাত তিনটের সময়? আমি ভাবছি, এর কারণ কী হতে পারে?

আমারও তো সেই এক প্রশ্ন। ডঃ নিগুচির উত্তর।

রান্না শেষ হয়ে গেল রাত ন' টার মধ্যেই। আমরা ডিনারে বসলাম। মদন এই কম সময়ের মধ্যে রেঁধেছিল বেশ ভালই ফ্রায়েড রাইস, তার সঙ্গে খুব সাদামাটা করে মুরগীর ঝোল। স্যালাড এবং পুডিং ছিল তার সঙ্গে। ব্যাস।

তৃপ্তি করেই খেলেন অতিথিরা।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, হোটেলের রান্না খেতে খেতে পাকস্থলীতে মর্চে পড়ে যাচ্ছিল। ডঃ বাসুর কৃপায় একটু নিষ্কৃতি পাওয়া গেল ত থেকে।

খাওয়ার সময় দেখলাম ডঃ নিগুচি যেন কথাবার্তা বলতে পছন্দ করেন না। বলতে কি, খেতে শুরু করার পর তিনি একদমই কথা বলেন নি।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, ডঃ নিগুচি ভোজন রসিক। ওঁর ধারণা খেতে খেতে গল্প করলে মনটা আর খাওয়ার দিকে থাকে না। ফলে কী খেলেন, কী তার স্বাদ সে সব আর উপভোগ করা যায় না বলেই তিনিই কথা বলেন না।

ডঃ রামচন্দ্রনের কথায় ডঃ নিগুচি একটু হাসলেন শুধু।

রাত দশটায় গাড়িতে করে ওঁদের হোটেলে পৌঁছে দিলাম এবং সেই সময়ই কতকটা নাটকীয় ভাবেই বলে ফেললাম, যদি সত্যিই আপনি আবার বায়ার্ডে অভিযান চালাতে চান, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। রাত তিনটের সঙ্গে ওই শব্দের সম্পর্ক কী সেটা জানার জন্যে আমার মন খুবই কৌতুহলী হয়ে উঠেছে।

আমার কথা শুনে যেন লাফিয়ে উঠলেন দু'জনেই। আনন্দে আমার হাতদুটি চেপে ধরলেন ডঃ রামচন্দ্রন। বললেন, আমি ভাবতে পারিনি, সত্যিই আমাদের আপনি সাহায্য করবেন। আসলে আমি আজ চেয়েছিলাম উজাড় করে আমার সমস্ত কথা আপনাকে বলবো। বলেওছি। আপনাকে ধন্যবাদ, সব কথা আপনি ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছেন। এই ভাবে এর আগেও সাহায্য পাওয়ার আশায় দু' একজনকে সব বলেছিলাম। তাঁরা সবাই, আমার কথা শোনার পর আমাকে এড়িয়ে গেছেন। পরে আড়ালে মন্তব্য করেছেন— লোকটার মাথা খারাপ। সে মন্তব্য অন্যের মারফৎ আমার কানেও এসে পৌঁছেছে। ভেবেছিলাম আপনি হয়ত তাদের চেয়ে আরও চালাক। শুধু শোনেন নি। আমাদের আদর আপ্যায়নও করলেন। তারপর কোন মন্তব্যই করলেন না দেখে ভেবেছিলাম, হয়ত আপনিও এড়িয়ে যাবেন।

ডাঃ নিগুচি বললেন, তাহলে ডঃ বাসু সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, সত্যি। তিনি কোন কিছু করার আগে হাজার বার ভাবেন। করার পর একবারও ভাবেন না।

ডঃ নিগুচির প্রশংসাসূচক কথায় আমি বললাম, ধন্যবাদ। ঠিক

তা নয়। প্রবলেমটা আমার কাছে দারুন ইনটারেস্টিং মনে হয়েছে বলেই, বললাম। হাঁ, ভাল কথা, ডঃ রামচন্দ্রন, আপনার সব সঙ্গীরা কোথায়? সেই সব আদিবাসীরা?

আমার প্রশ্নে ডঃ রামচন্দ্রন হেসে উঠলেন। ও সব কথা আর বলবেন না। এখন তারা সব ভারত দর্শনে বেরিয়েছে। ওদের নিয়ে গেছে আমার সহকারী ডঃ খুরসেদ। খুরসেদ এক সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতো। এখন সে-ও আমার সঙ্গে বাউণ্ডুলের জীবন যাপন করছে। একেবারে ছোকরা। বছর আটাশ বয়েস। কিন্তু অদ্ভুত রকমের ভালো ছেলে। তার সঙ্গে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডঃ লয়েড।

দারুন অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়াচ্ছেন, মশায়। বললাম আমি। আচ্ছা শুভরাত্রি।

শুভরাত্রি। বললেন ডঃ নির্গুচি এবং রামচন্দ্রন।

আমি বিদায় নিলাম।

একটি চকিত চিন্তা এবং তারপরই সমাধান

কী বলব আপনাদের, হোটেলে ওঁদের পৌঁছে দিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরতে যেটুকু সময় লাগলো এই যা। কত আর সময় লাগলো? রাতের দিকে ফাঁকা পথ থাকায় ফিরতে মিনিট পনেরর বেশি নয়। ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই হঠাৎ একটা চিন্তা মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে গেল আমার! তাইতো, এটাও তো হওয়া অসম্ভব নয়, চিন্তটা মনের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে বসলো। এবং মনে হল, যে ভাবনাটা ডঃ রামচন্দ্রনের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, তার সমাধান যে এত সহজে পাওয়া যাবে, সেটা কি সম্ভব?

ফ্লাটে ফিরেই মদনকে বললাম, তুই ঘুমুতে যা। আমি এখন একটু কাজ করবো। মদন আমার অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত। সে

জানে এবার নিশ্চয় কোন বড় রকমের ভাবনা নিয়েই আমি বসবো এবং সারারাতই হয়ত আমাকে জেগেও কাটাতে হতে পারে। তাই সে আর কোন কথাই বললো না। শুতে যাওয়ার আগে এক ফ্লাস্ক কফি রেখে গেল আমার জন্যে।

অতঃপর সারারাত কাটলো প্রায় জেগেই বলতে পারেন। সারা রাত ধরে আমি বায়ার্ড উপদ্বীপের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বিশেষ করে রাতের আকাশের কয়েকটি নক্ষত্র সম্পর্কিত পুরণো নথিপত্র দেখে নিলাম। সেই সঙ্গে দেখলাম বিশ্ব সময় অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থান। সঙ্গে চললো নানারকম আঁক কষার কাজ। সে সব জটিল অঙ্কের কথা এখানে বলে আর কী হবে? তবে ওই অঙ্ক কষতে কষতেই সমাধানের মূল সূত্রটি আমার নজরে পড়ল।

উত্তেজনায় এখন আমি কাঁপছি। বাড়াবাড়ি বলছি না সত্যিই কাঁপছি আমি।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এই তো বাছাধন। পেয়েছি তোমায়। রাত তিনটের সময় এমন অনর্থ তুমি ছাড়া তো বাপু কেউ করতে পারে না?

হ্যাঁ। এই তো বায়ার্ড। এই তো বায়ার্ডের ওপরকার আকাশ। ওই তো ওখানে তুমি দাঁড়িয়ে, বাবা। কত ডিগ্রী হবে? না, আঁক কষে মনে হচ্ছে ঠিক মাথায় ওপর। অঙ্কটা বার বার কষলাম। উত্তর ভুল হয়নি। এই সময়টায় ওই নক্ষত্রটির এখন বায়ার্ডের আকাশে ঠিক মাথার ওপরেই তো থাকার কথা। যাক। আপাততঃ এখানেই থাক। তবে যা কিছু করার আগামী কুড়ি দিনের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। তারপর ওই নক্ষত্রটিকে সেখানে আর দেখা যাবে না। অদৃশ্য হয়ে যাবে কয়েক মাসের জন্যে। তবু ঠিক করলাম, পরদিন ট্রাঙ্ককল করে উটকামণ্ডের রেডিও টেলিস্কোপ স্টেশনে ডঃ কাপুরের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করবো। আসল কাজটি শুরু

করার আগে আমার গণনাটা ঠিক কি না একবার পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার।

রাত প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা খানিকের জন্যে চেয়ারে বসেই ঝিমিয়ে নিলাম! তারপর ভোর ছ'টা নাগাদ স্নান সেরে আবার কিছুক্ষণের জন্যে বসলাম লেখার সরঞ্জাম নিয়ে। মদন এল ব্রেকফাস্ট হাতে।

আটটা নাগাদ টেলিফোনে প্রথমে যোগাযোগ করলাম ডঃ রামচন্দ্রনের সঙ্গে।

সুপ্রভাত! আমার কণ্ঠস্বর তখন উত্তেজনায় কাঁপছে।

সুপ্রভাত, ডঃ বাসু। ওপার থেকে ডঃ রামচন্দ্রনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

শুনুন। শব্দের সমাধান আমি বোধ হয় পেয়ে গেছি। না ভৌতিক কোন ঘটনা নয়। মনে হচ্ছে দিন কুড়ির মামলা। এক নাগাড়ে বকে চললাম আমি। যদিও জানতাম, এসবের কিছুই তাঁর বোঝার কথা নয়।

কী বলছেন আপনি, ডঃ বাসু? এবার ওপারের কণ্ঠস্বরেও বিস্ময়।

শুনুন। দুটি কাজ এখন আপনাকে করতে হবে। এক, খুরসেদকে টেলিগ্রাম পাঠান। দলবল নিয়ে এখনই যেন সে কলকাতায় ফিরে আসে। দুই, টেলিগ্রাম পাঠানোর পর, আপনারা এখানে চলে আসুন। হ্যাঁ ভাল কথা, মঙ্গা এখন কেমন?

মঙ্গা ভাল আছে। অপেক্ষা করুন, আমরা আসছি।

আসুন। তখন সব বলবো কেমন?

ডঃ রামচন্দ্রনের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে উতকামণ্ডে ডঃ কাপুরের সঙ্গে একটি ট্রাঙ্ককল বুক করলাম।

এক ঘণ্টা বিরতি।

তারপরই ডঃ রামচন্দ্রন এবং ডঃ নিগুচি এলেন।

মদনকে ওদের জন্যে কফি তৈরি করতে বলে বসার ঘরে গিয়ে বসলাম আমরা।

শুনুন, ডঃ নিগুচি। এই হলো ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছে, আমি কোন ভুল করিনি। বলেই গত রাতে যা যা ভেবেছিলাম, ডঃ নিগুচিকে বললাম।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক তো একেবারে থ। কিছুক্ষণ যেন কোন কথাই বলতে পারলেন না। তারপর আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

ডঃ রামচন্দ্রন একবার আমার একবার ডঃ নিগুচির মুখের দিকে চাইছেন।

বললাম, বুঝলেন কিছু?

বোঝালেন আর কোথায়? তাঁর কণ্ঠে হতাশা।

শুনুন তাহলে। বলেই আসল ব্যাপারটা জটিল জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্ব ছাড়া তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

আমার কথা শুনে তিনি পুলকিত। বললেন, তাহলে কুড়িদিন পর জায়গাটা নিরাপদ হচ্ছে। তখন আমরা সেখানে গেলে আর বিপদ হবে না।

কুড়ি দিন পরে কি, মশায়। তার আগেই আমাকে যেতে হবে। আপনি যেমন পুরনো মানুষের সন্ধানে রয়েছেন, সেটা দুদিন পরে চেষ্টা করলেও চলবে। কিন্তু আমি তো আর বেশি সময় পাবো না। আমি যাচ্ছি আর একজনের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে। কুড়ি দিনের মধ্যে সেখানে না যেতে পারলে সে রহস্যের সমাধান যে করতে পারব না? ভয় নেই, কয়েকদিন সেই রাক্ষুসে শব্দ আপনাদের শোনাবো। হ্যাঁ, মশায়, রাত তিনটের সময়ই শুনবেন। তবে শব্দ যাতে এবার কারোর ক্ষতি না করতে পারে তার জন্যে অবশ্য আমরা কোমর বেঁধে যাচ্ছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই উতকামণ্ডের লাইন পাওয়া গেল। হ্যাঁ, ডঃ কাপুর কথা বলছেন।

এই এক কাজ পাগলা লোক। পৃথিবীতে পা ফেলে একটা মানুষ সারাটা জীবন শুধু আকাশে আকাশেই কাটিয়ে দিলো। যত রাজ্যের গ্রহ নক্ষত্র, তারাই যেন তার আপনার। সম্ভবতঃ ভোর থেকেই মানমন্দিরে এসে বসে আছেন।

হ্যালো। আমি ডঃ বাসু কথা বলছি।

কেমন আছো, ডঃ বাসু? এনি প্রবলেম? ডঃ কাপুর সরাসরি কথা বলতে ভালবাসেন।

প্রবলেম তো বটেই। নইলে ভোরে আপনাকে জ্বালাতে যাবো কেন? বললাম আমি।

দ্যাটস্ অল রাইট। ডঃ কাপুরের উত্তর।

সংক্ষেপে ডঃ কাপুরকে আমার সমস্যার কথা বললাম।

হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছ তুমি। যে নক্ষত্রটির কথা বলছ, এখন সেটি বায়ার্ডের আকাশে ঠিক মাথার উপরই থাকার কথা, বললেন ডঃ কাপুর। —ওয়েল, ফোনটা একটু ধর তো। আমি অ্যালমানাকটা একটু দেখে নিই।

এক মিনিট বিরতি।

ডঃ কাপুর আবার কথা বললেন: ইয়েস। জাস্ট দ্য রাইট। তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমার গণনা ঠিক। নক্ষত্রটি—জানতো—এখন তার পরমায়ুর শেষের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। আমাদের রিপোর্ট, সেখানে মাঝে মাঝেই বড় রকম বিস্ফোরণ ঘটছে। মানে বিস্ফোরণের মধ্যে ভেঙে টুকরো হয়ে যাবার মুখে আর কি।

মাঝখানে তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, জানি। এমনটিই শুনেছিলাম আগে।

তাহলে ঠিকই শুনেছো। মেরু অঞ্চলে বেশ কয়েকটি দল নক্ষত্রটির উপর নজর রাখার জন্যে হাজির হয়েছে এখন। অবশ্য বায়ার্ডে

কারোর কোন প্রোগ্রাম আছে কী না জানি না। তবে এই পর্যবেক্ষণ, আই মিন দিস অবজারভেশন উইল ইলড্ এ লট। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুবই লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। তা কী ব্যাপার বলতো ?

এখন না। দিন কুড়ি যাক, বলবো।

ওল রাইট ! ওল রাইট, উইস ইউ গুড লাক্।

ধন্যবাদ, ডঃ কাপুর !

টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

দেখলাম আমার পাশের দু'জনের মুখে আবার বিস্ময়।

ডঃ নিগুচি বললেন, তাহলে যেমনটি ভেবেছেন তার সবটাই ঠিক, কি বলেন, ডঃ বাসু ?

তত্ত্বের দিক দিয়ে ঠিক। বলতে পারেন এসব এখনও আমার অনুমান। এবার চলুন যথাস্থানে গিয়ে আমরা হাজির হই আগে। তারপর—যার শেষ ভাল তার সব ভালো, বুঝলেন তো ?

অতএব !

পাঁচদিন গেল প্রস্তুতির জন্যে। ডঃ রামচন্দ্রনের টেলিগ্রাম পেয়ে সদলবলে ডঃ খুরসেদ এবং লয়েড ফিরে এলেন গাংগো এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে। মাঝে মঙ্গার সঙ্গে বেশ খানিকটা আলাপ হয়ে গেল। লোকটি বেশ বুদ্ধিমান বলতেই হবে। গাংগো তুলনায় একটু পাগলাটে গোছের। বেশ লম্বা, এবং ছিপ ছিপে। এখন ওরা আসছে আবু হিলস থেকে। সবাই উঠেছে অভিজাত হোটেলে।

কয়েকটি ফরম্যালিটি সারতে গেল আরও দুদিনের মত। আমার পরিকল্পনার কথা শুনে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি কিছুই হোত না যদি না এ সময়ে আমার পুরনো বন্ধু মিচেল পোলস্কি জেনিভায় থাকতেন। আমার অনুরোধে তিনি কর্তৃপক্ষদের বোঝাতে সমর্থ হলেন, যে পরীক্ষার কাজে আমি হাত দিতে চাই মৌল-জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানে তার ভূমিকা অপরিসীম। তা ছাড়া এটা এমন একটি পরীক্ষা যার

জন্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বসে থাকা চলে না। যা কিছু করার আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই করতে হবে। বলা বাহুল্য আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা এবং ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি উভয়েই আমাদের যতরকম ভাবে সম্ভব সাহায্য করবেন বলে সম্মতি জানালেন। ঠিক হলো প্রথমে আমরা যাব পোর্তোরিকোতে। সেখান থেকে গবেষণার কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবো রিয়ো ডে জেনেরিও এবং সেখান থেকে তিয়েরা দেল ফুয়েগোতে। দক্ষিণ আমেরিকার ডগার মত যে অংশটি সোজা দক্ষিণে এগোতে এগোতে বাঁ পাশে বাঁক নিয়েছে, ঠিক সেখানটায় এই বন্দরটি অবস্থিত। সেখান থেকে আবার যাত্রা।

দুদিন পর অস্ট্রেলিয়ার দশজন আদিবাসী, ডঃ নিশুচি, ডঃ খুরসেদ এবং আমি পৃথিবীর এক দুঃসাহসিকতম অভিযানে যাত্রা করলাম। তিয়েরা দেল ফুয়েগো পর্যন্ত যাত্রার বিবরণ এখানে দিতে চাই না। কারণ মূল কাহিনীর সঙ্গে তার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। শুধু এটুকু বলে রাখি, দেল ফুয়েগো থেকে কোন বিদেশী সরকারের বিমান বহরের একটি বিশেষ বিমানে আমরা রওনা হলাম বায়ার্ডের উদ্দেশ্যে। এই প্লেন বায়ার্ডের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি জায়গায় আমাদের পৌঁছে দিল। সেখানে বিমান বহরের চারটে হেলিকপ্টার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এই হেলিকপ্টারে চড়েই অবশেষে আমরা হাজির হলাম বায়ার্ডের ঠিক সেই অঞ্চলে ডঃ রামচন্দ্রন যেখানে থেকে কিছুদিন আগে প্রাণঘাতী শব্দ শুনে ভয়ে চলে গিয়েছিলেন।

না, পথে কোন অসুবিধে হয় নি। আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম থেকে শুরু করে দুর্গম এই অঞ্চলে কিছুদিন বাস করার মত সমস্ত ব্যবস্থা পরিপাটি করেই করা হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, হ্যাঁ, এই তো? মানুষে মানুষে এই যে সহযোগিতা, তার প্রশস্ত পথ পৃথিবীতে কেউ যদি খুলে দিয়ে থাকে, তাহলে সে বিজ্ঞান। রাজনীতিতে দর কষাকষি আছে। সাহিত্য, কলা এবং শিল্প নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলে। কিন্তু, একটি পারমাণবিক চুল্লী

নিয়ে চলে না। অথবা ক্যানসার নিরাময়ের বিকীরণ প্যানেল অথবা পেনিসিলিন, এ সব কাজে লাগানর সময় কেউ মাথা ঘামান না, কে তাদের আবিষ্কার করেছে, তারা কোন দেশের লোক, সেই দেশের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্কটি কেমন।

বায়ার্ডে এসে প্রথম ঘণ্টা পাঁচেক গেল বেশ ক্যাম্পের জায়গা নির্বাচন এবং ক্যাম্প স্থাপনে। আমাদের নিরাপদে পৌঁছোনর খবর দিলাম বেতার সংকেতের সাহায্যে দেল ফুয়েগোতে। জানালাম, 'ধন্যবাদ। সব কিছু ঠিক ঠাক চলছে।' এই সঙ্গে জেনিভার আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থার চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানালাম।

চারটি হেলিকপ্‌টরই থেকে গেল। পাছে কোন বিপদ ঘটে এবং সেই সময় আমাদের উদ্ধার করতে হয়, এর জন্যেই।

ডঃ নিগুচি এবং ডঃ খুরসেদ অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারেন দেখলাম। আদিবাসীদের সাহায্যে শুকনো বরফ খুড়ে তৈরী করা হলো এক একটি সেল। ডঃ লয়েড এবং আমি সাজ সরঞ্জাম বসানোর কাজে লেগে গেলাম।

মঙ্গা দেখলাম সত্যি সত্যিই খুব চালাক চতুর লোক। ডঃ রামচন্দ্রনের সঙ্গে কয়েক বছর থেকে ভাঙ্গা ইংরেজি শিখেছে। কিন্তু তাতেই কাজ চালিয়ে নিচ্ছে দারুণ ভালভাবে।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, ডঃ বাসু, সভ্য হওয়া মানেই আত্ম-কেন্দ্রিকতা। মানুষ সভ্য হলে একমাত্র নিজের এবং নিজের গোষ্ঠী ছাড়া বড় একটা কারোর কথা ভাবতে চায় না। চাইলে দেখতো যাদের আমরা বর্বর, আদিবাসী প্রভৃতি বলি কত বেশি মানবিক গুণ এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে পড়ে রয়েছে। মেধা, জ্ঞান সব—।

জানি। নইলে পূর্বপুরুষদের জ্ঞান এত হাজার হাজার বছর ধরে কী করে তারা বয়ে নিয়ে চলেছে? বললাম আমি।—হ্যাঁ, ভাল কথা, ওই যে কী একটা শেকড়ের কথা বলেছিলেন না। খেলে শীতে

আর কষ্ট হয় না। দিন না এক টুকরো জোগাড় করে। অভিজ্ঞতাটা দেখে নিই।

ডঃ রামচন্দ্রন গাংগোকে ডেকে শেকড় দিতে বললেন, শেকড়টি খেলাম।

বিশ্বাস করুন। শেকড় খাওয়ার আধ ঘণ্টা পর আবহাওয়া মাপার থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপতে গিয়ে আমার চোখ তো চড়কগাছ। আর একটু হলে আমি কেঁদেই ফেলেছিলাম আর কি। গলার স্বর যেন জড়িয়ে এল ভয়ে।

ডঃ নিগুচি, ডঃ রামচন্দ্রন, তাড়াতাড়ি আসুন একবার এদিকে। কাতর কণ্ঠে ডাকলাম আমি।

কী ব্যাপার—?

দেখুন তো আমি বেঁচে আছি কি না? মশায় শূন্যের নীচে তিরিশ ডিগ্রীতে গিয়ে কারোব শরীরেব তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়ায়, বলুন সেই লোকটি বেঁচে আছে বলে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন?

ডঃ নিগুচি বললেন, ভুলে যাচ্ছেন ডঃ বাসু, এখন আবহাওয়াব তাপমাত্রাই শূন্যের নীচে একত্রিশ ডিগ্রীতে চলছে।

জানি। এই শেকড়েব কথা বলছেন তো? এ যে অসম্ভব ব্যাপার। এক টুকরো শেকড় দেহের তাপমাত্রা নাকি আবহাওয়ার তাপমাত্রার কাছাকাছি নিয়ে এসেছে—এ যেন ভাবা যায় না।

ঘাবড়ানোরই কথা। শেকড় অসম্ভব কাজ করতে পারে হয়ত, করেওছে। কিন্তু সেই অদ্ভুত কাজটার সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়েই চিরকালের সংস্কার প্রথমটায় যেন সত্যিই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

মঙ্গা আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সাবধানতা নেওয়া হল যত রকমের সম্ভব ততটাই। বরফ কেটে তাঁবুগুলি বসান হল এক একটি গর্তের মধ্যে। গর্তগুলিকে আবার পলিথেলিনের পুরু-চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হল। তাছাড়া ডঃ নিগুচি

তাঁর বিশেষ এক পদ্ধতিও কাজে লাগালেন। মাঝারি ধরনের বরফের চাঁই সকলে মিলে আমরা বয়ে নিয়ে এসে গর্তের চার পাশে ছড়িয়ে দিলাম। এতে করে, যত প্রচণ্ড শব্দই হোক না কেন—তরঙ্গগুলি গর্তের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই সমস্ত বরফের চাঁই-এ প্রতিফলিত হয়ে নিজস্ব ছন্দ হারিয়ে ফেলবে। ফলে তীব্রতা কমবে, বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে। তাতে মানুষের আর তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। ঠিক গঙ্গাব জোর বান ভাঙ্গার জন্যে গঙ্গার দুপাশে মাঝে মাঝে যেমন পাথর বসান হয় ব্যাপারটার আইডিয়াটা কতকটা তাই। তা ছাড়া গর্তের মধ্যে তাঁবু। মাথার উপর পলিথেলিনের পর্দা—এরাও শব্দকে খানিকটা বাধা দেবে।

তাঁবু থেকে কিছু দূরে বসান হল শব্দ পরিমাপক যন্ত্র, ম্যাগনেটো মিটার কাউন্টার, যার সাহায্যে মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয় কণার মাত্রা জানা যাবে, ঝড় মাপার যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র, এ সব। কাউন্টারের সঙ্গে জোড়া ছিল আমার নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী একটি কমপ্যুটার বা যন্ত্রগণক তার সঙ্গে একটি ঘড়ি। ঠিক কোন সময়ে কী ধরনের তেজস্ক্রিয় কণা মহাকাশ থেকে এসে এখানে পড়েছে এবং কী পরিমাণে যন্ত্রগণকই তা জানিয়ে দেবে। অদূরে একটি খুদে রেডিও-টেলিস্কোপও বসান হয়েছে।

এ সব করতে করতে সন্ধে প্রায় ছ'টা হয়ে গেল। সন্ধে কথাটা অবশ্য বললাম পুরনো অভ্যাসবশতঃ। ঘড়ির কাটা যেখানে থাকলে আমাদের সন্ধে হয় তার উপর নির্ভর করে। আসলে মেরুতে আর সকাল সন্ধে কোথায় বলুন ? এখন তো একটানা দীর্ঘ দিন চলেছে। অস্পষ্ট আলো, ম্লান সূর্য, এবং ইত্যাদি।

দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। কারণ বায়ার্ডে পা দেবার পর সবাই আমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, ওসব প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে দেখার অবসর আমাদের আর ছিল না। বুঝতেই তো পারছেন, সময়ের সঙ্গে আমাদের ছুটতে হচ্ছে।

রাতের দিকে একটু সকাল সকালই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সবাইকে বললাম, রাত তিনটের আগে সব জেগে উঠতে হবে। জেগে থাকলে প্রচণ্ড শব্দের ঝটকাটা সামলানো খুব একটা শক্ত হবে না। ঘুমিয়ে থাকলে আচমকায় ক্ষতি হতে পারে। তার জন্যে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েও রাখা হল।

বিরতি!

রাত সোয়া তুটোর অ্যালার্ম বেজে উঠল। অমনি সবাই আমরা জেগে উঠলাম। জেগে ওঠার পর প্রথম কাজ প্রচণ্ড শব্দের বিরুদ্ধে আরও কিছুটা সতর্কতা গ্রহণ করা। এর জন্যে, প্রত্যেকেই আমরা কানে তুলো গুঁজে নিলাম। সমস্ত শরীর বিশেষ এক ধরনের স্পঞ্জের তৈরী পোশাকে আবৃত করলাম। যার মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল একমাত্র চোখ এবং নাকের ডগা ছাড়া সমস্ত কিছু। অদ্ভুত এই পোশাকগুলি দিয়েছেন ফরাসী বিজ্ঞান-আকাদেমির অধ্যাপক ডঃ লোরেন। সেখান থেকেই পোর্তোরিকোতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে ছোট একটি চিঠিতে লিখেছেন, ডঃ বাসু, এই পোশাকে আপনাদের শব্দের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রচণ্ড শব্দ সরাসরি কানের পর্দা যেমন ফাটিয়ে দিতে পারে, তেমনি শরীরের আর কোষেরও ক্ষতি। সূক্ষ্ম রক্তবহা নল প্রচণ্ড কম্পনে ছিঁড়ে নিয়ে শরীরের মধ্যে রক্ত ক্ষরণ ঘটাতে পারে, মস্তিষ্ক কোষ ছিঁড়ে ফেলে মাথার গোলমাল ঘটাতে পারে। এমন কি হৃদপিণ্ডের কপাটিকা হঠাৎ আছড়ে ফেলে হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজটি নষ্ট করে দিতে পারে। সম্ভবতঃ ডঃ রামচন্দ্রন যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এর কোন কোনটি বা সবটার জন্যেই সে সব হয়েছে। পাঁচটি লোকের মৃত্যু হয়ত এইভাবেই হয়ে থাকবে।

আড়াইটের সময় ডঃ নিগুচি বসলেন ম্যাগনেটো মিটারের প্যানেলের সামনে। একটি কাঁচের পর্দায় সবুজ আলোর নাচন তাঁর সামনে। বাইরে উন্মুক্ত বরফের উপর বসান সেই যন্ত্রটি তার

আশপাশে যখন যে মুহূর্তে যে ধরনের পরিবর্তন চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘটছিল, তারের মধ্যে দিয়ে তার বার্তা এসে পড়ছিল ওই প্যানেলে। তারই সংকেত ওই আলোর নাচন।

আমার সামনে বেতার টেলিস্কোপের প্যানেল। ডঃ খুরসেদের সামনে তাপ এবং চাপমান যন্ত্র। বলা বাহুল্য সবই ইলেকট্রোনিকস্ যন্ত্র। ডঃ রামচন্দ্রন, ডঃ খুরসেদ এবং ডঃ লয়েড আমাদের সাহায্য করছিলেন। মঙ্গা এবং গাংগো তাঁবুর এক কোণে বসে আমাদের ম্যাজিকের খেলা দেখতে লাগল। এদের দু'জনকে আমরা সব সময় কাছে কাছে রাখতাম। কারণ, অমন বুদ্ধিমান দুটি মানুষ এবং উপকারী বন্ধুর কোন ক্ষতি হয় আমরা চাই নি। কী জানি, বলা তো যায় না। এত সাবধানতা নিয়েও যদি শেষ পর্যন্ত ওদের কোন ক্ষতি হয়? ডঃ রামচন্দ্রন যে সম্ভাবনার কথা ভাবছেন, সে কাজ যে একেবারে পণ্ড হয়ে যাবে।

বিরাত! প্রায় পাঁচ মিনিট।

সারা তাঁবুতে তখন শ্মশানের নীরবতা।

প্রথম শব্দ করল মঙ্গা। ডাক্তার রাম, দেখুন তো যন্তরটা আপনাদের একবার?

কী ব্যাপার? আমরা সবাই চমকে উঠলাম। তার দিকে চাইতেই চোখ গিয়ে পড়ল গাংগোর ওপর। দেখি, একবার করে সে ডান হাতটা মুখের মধ্যে পুরে দিচ্ছে, তারপরই সেটি বের করে তার আর এক হাতের চেটোর উপর বোলাচ্ছে। এইভাবে চলল দশবার।

গাংগো তারপর মঙ্গাকে তার নিজের ভাষায় কী যেন বলল।

মঙ্গা বলল, বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ছে।

আশ্চর্য! বললেন ডঃ খুরসেদ। সত্যিই তো তাপমাত্রা বাড়ছে। কী করে গাংগো জানল এ সব?

মঙ্গা বুঝিয়ে দিল, এ আর শক্ত কী। আমাদের বাপঠাকুর্দার আমল থেকেই তো এইভাবে চলছে। ওই যে দেখলেন না, গাংগো

একবার করে মুখের মধ্যে হাত পুরে হাতের চেটোয় বোলাতে লাগল ? আসলে মুখের ভেতরকার তাপমাত্রা—

ডঃ নিগুচি বললেন তিন মিনিটে তিন ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়ল।

আবার গাংগো চঞ্চল হয়ে উঠল। দেখি কানের ঠুসিটি খুলে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে সে। তারপর মঙ্গাকে কী বোঝাল।

মঙ্গা রিলে করল তার কথা। গাংগো বলছে, এখুনি ঝড় উঠবে। তার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

তাই তো ? একেবারে তাজ্জব ব্যাপার! এই তো, বাতাসে চাপ কমছে হঠাৎ।

শুধু তাপমাত্রার বৃদ্ধি নয়। ঝড়ের ইংগিত নয়।

প্রায় একই সঙ্গে ডঃ নিগুচি এবং আমি চমকে উঠলাম।

ডঃ নিগুচি, আপনার ভিসন প্লেটটি দেখুন তো? বললাম আমি।

আলোর নাচন বেড়েছে, বাড়ছে, দ্রুত বাড়ছে—নিগুচির উত্তর।

আমার কাউন্টারও এখন ব্যস্ত। মহাজাগতিক কণার ঝড় বইছে। ইলেকট্রোন, প্রোটন—না না, তা কেন হিলিয়াম নিউক্লিয়াসও তো ধরা পড়ছে যেন? বললাম আমি,—আরে, দেখুন তো সবাই আপনারা মশায়? হ্যাঁ, এই যে, রেডিও টেলিস্কোপের পর্দার ওপর বাঁ পাশটা দেখুন? একটা হলদে আলোর মত মনে হচ্ছে না?

তাইতো মনে হচ্ছে ?

আলোটি ক্রমেই সরে এল মাথার ওপর। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। ডঃ কাপুর তো ঠিকই বলেছেন তাহলে? সেই নক্ষত্রটা। ভাঙছে। ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। যৌবন শেষে বার্ধক্য। তারপর সেই বার্ধক্যের জরা বয়ে মৃত্যু যখন এগিয়ে আসে তখন তার দেহ মনের ওপর তার যেমন কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, এক্ষেত্রেও যেন তাই ঘটছে ? একদিন এই নক্ষত্র যৌবনে কত সতেজ ছিল। এখন মৃত্যুর পালা।

এখন ক্রমেই সে ভগ্ন—বিলুপ্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে। সত্যি কথা বলতে কি, এখন আমরা সত্যিকারের একটি তারার মৃত্যু চোখের সামনে দেখছি।

চৌম্বক ঝড় এবার আরো বাড়ল। ডঃ নিগুচি বললেন।

বাতাস অশান্ত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রগণকের উপর হুমড়ি খেয়ে বললেন ডঃ খুরসেদ।

হ্যাঁ, কাউন্টারে এবার মহাজাগতিক কণার সংখ্যাও ধরা পড়ছে বেশি। আমার মন্তব্য।

সাবধান ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় তিনশ কিলোমিটার। ডঃ নিগুচি। ডঃ লয়েড, দয়া করে সময়টা একবার দেখুন তো? আমার জিজ্ঞাসা। তিনটে বাজতে এক মিনিট বাকি। ডঃ লয়েডের উত্তর।

ডঃ রামচন্দ্রন, তাহলে অ্যালার্মটা বাজিয়ে দিন।

ডঃ রামচন্দ্রন আমাদের পাশাপাশি চারটে তাঁবুর অ্যালার্ম বাজালেন। এর অর্থ ওই সব তাঁবুতে যারা আছ, এক্ষুনি মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড় মুখে রুমাল গুঁজে। সমস্ত যন্ত্রপাতি থেকে সরে এসে আমরাও তাই করলাম। আর ঠিক পর মুহূর্তেই!

বলব কি আমাদের মশায়। বাজ পড়ার শব্দ যে অমন হয়, জীবনে জানতাম না। অবশ্য বলতে বাধা নেই। শব্দপ্রতিরোধী পোশাক এবং শব্দ যাতে কম শোনা যায় তার যাবতীয় ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও যেটুকু কানে এল তাতেই আমাদের অবস্থা শোচনীয়। মনে হল, কে যেন আমাদের দেহগুলি মাটি থেকে সটান তুলে নিয়ে এক পাশে আছাড় মারল দু'বার করে। তার মানে শব্দ আমরা কম শুনেছি ঠিকই। কিন্তু পুরো শরীরটা, বরং বলি আমাদের মোড়কশুদ্ধ শরীর তখন যেন ইঁট এবং পাথর। পাশে প্রচণ্ড শব্দ করলে একখণ্ড ইঁট যেন পথের এপাশ থেকে আর এক পাশে ঠিকরে পড়ে, ঠিক তেমনই একটি ব্যাপার ঘটল আমাদের ক্ষেত্রেও। আর সেই সঙ্গে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, গর্তের মধ্যে শুয়ে থাকলেও তার উপর দিকে

যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার মুখে যদি আমরা পড়তাম তাহলে এক টুকরো কাগজের মত কোথায় যে আমরা উড়ে যেতাম, কে জানে ?

বেশি না। মাত্র তিন মিনিট ওই ভাবে আমাদের কাটল। স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ঘণ্টা বাজিয়ে তারপরই জানিয়ে দিল, ঝড় চলে গেছে। একটা যেন দমকা বাতাস। এল এবং গেল। তারপরই সব স্বাভাবিক।

মাটি ছেড়ে যে যার উঠলাম আমরা

বাইরে বেরিয়ে এসে অন্যসব তাঁবুতে গেলাম আমরা। না। কোথাও কোন গোলমাল হয় নি। তবে সবার চোখ মুখেই সন্ত্রাসের চিহ্ন। হেলিকপটরগুলি বরফখুঁড়ে গর্তের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল বলে, তাদেরও কোন ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল ? ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, ডঃ রামচন্দ্রন। ওই দেখুন, একটা পতাকা আমি ওই দূরে কোথায় পুঁতে রেখেছিলাম। কই, তার তো কোন চিহ্নই কোথাও দেখতে পাচ্ছি না ? বলেই যেন কেঁদে ফেললেন তিনি। এত, সব চেষ্টার পর, সব গেল আমার ?

তাইতো ?

ডানদিকে প্রায় এক হাজার গজ দূরে একটি জায়গার দিকে ছুটে গেলাম আমরা। গাংগোর সাহায্যে সেখানে তিনি একটি কাঠের দণ্ডের ডগায় একটি পতাকা পুঁতে রেখেছিলেন তিনি। দণ্ডটি প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু একটি কঠিন বরফের স্তূপের ওপর পোঁতা ছিল। প্রাচীন মানবের কবর আবিষ্কারের জন্যে ঠিক কোন দিক বরাবর তিনি আগামীকাল কাজ করবেন, এটা তারই নিশানা।

গিয়ে দেখি, সেখানে বিরাট গর্ত। বরফের স্তূপটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ঝড়ের তোড়ে পতাকা কোথায় উড়ে গেছে। পরিবর্তে মস্ত একটি উল্কা পিণ্ড সেখানে পড়ে।

ডঃ নিগুচি বললেন, এই শয়তানই তাহলে বরফটাকে ফাটিয়ে

দিয়েছে। দিক। কিন্তু এখন আমি কী করি। ডঃ রামচন্দ্রন এবার হতাশায় কেঁদে ফেললেন।

একেই বলে কাজ পাগল। কাজের মধ্যে যারা পুরোপুরি ডুবে থাকে, জানতাম আর কোন দিকে তাঁদের খেয়াল থাকে না। কিন্তু সেটা যে এতখানি প্রবল হতে পারে, ডঃ রামচন্দ্রনের ব্যাপারটা না দেখলে বিশ্বাস হত না। এখানে আসার সময় ওঁকে বলে রেখেছিলাম দিন আটেক সবুর করুন। বিপদটা কেটে যাক তারপর আপনি কাজ শুরু করবেন। কিন্তু সামনে একটা ছোট্ট 'হুঁ' করলেও আড়ালে এক সময়ে যে এখনই তিনি কাজে লেগে পড়বেন, কে জানত বলুন। তবু ভাল। ঐ মঙ্গা এবং গাংগো নামে দুই স্যাঙাৎকে নিয়ে আমাদের আড়ালে রাতেই ওই পতাকা ধরে কবর খোঁড়ার কাজটা তিনি শুরু করেন নি। নইলে ভাবুন তো। কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড হতে পারত। সহানুভূতি হল। তবু ডঃ রামচন্দ্রনকে বললাম, এ আপনি অন্যায় করেছেন। রাত তিনটে কেন। মেরু প্রদেশে এমন ঝড় এবং বাজ পড়া যখন তখন হতে পারে। আমরা যখন সঙ্গে রয়েছি, আমাদের সঙ্গে কথা না বলে এমন ঝক্কি নিয়ে আপনি ভাল কাজ করেন নি, ডঃ রামচন্দ্রন— !

কিন্তু— ! ডঃ রামচন্দ্রন কিছু বলতে চাইলেন।

না। কোন কিন্তু নয়। যতক্ষণ না আমি বলি বিপদ কেটে গেছে, আপনি চুপ করে আমার পাশে বসে থাকবেন। আমার কণ্ঠে শাসনের সুর।

ডঃ রামচন্দ্রন আমার দিকে শিশুর মত একবার চেয়ে চুপ করে গেলেন।

মঙ্গা বলল, খুব গুরুত্বপূর্ণ নিশান। অনেক খেটে খুটে বার করতে হয়েছিল। গাংগো অমন একটি জায়গা আবারকি খুঁজে বের করতে পারবে ?

রাত কাটল। কাল রাত। বিশেষ করে আমার কাছে তো বটেই। কারণ এমন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম।

পরদিন ভোরে, সভ্য জগতের ঘড়ির হিসেব মিলিয়েই একথা বলছি, কারণ মেরু অঞ্চলে রাত আর দিনকে কি করে পৃথক করব, বলুন। গত রাতের পাওয়া তথ্যগুলি নিয়ে ডঃ নিগুচির সঙ্গে আমি আলোচনা করতে বসলাম। অবশ্য আর সবাইও রইলেন। ডঃ রামচন্দ্রন করুণ মুখে বসলেন। আমার পাশে।

যাই হোক গতকালের ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা আমার আগেই ছিল, সে ইঙ্গিত তো আগেই আপনাদের দিয়েছি। এখন যা করছি, সেটা হল তার সত্যাসত্য যাচাই করা। আর সেটা করার জন্যেই তো এত ঝুঁকি। এত পরীক্ষা। তবে হ্যাঁ, বলতে বাধা নেই, যা চেয়েছিলাম, তার সবটাই যেন মিলে যাচ্ছে। আর যদি তা যায়, ডঃ রামচন্দ্রন এরপর নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবে। ওই ধরনের শব্দ আর তাঁদের কোন বিপদ ঘটাতে পারবে না। তবে এখন নয়। শেষ পর্যন্ত দেখা দরকার। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত একবার পর্যবেক্ষণ করেই করা শেষ হবে না।

হ্যাঁ, পর পর আটদিন কাটল, প্রচুর দুর্ভাবনা, সংশয় এবং ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যে ভাবে কাটল, সে যেন আটদিন নয়, আট যুগ। একই ধরনের রুটিন বেঁধে পরীক্ষা। রেডিও টেলিস্কোপের ওর মৃতপ্রায় নক্ষত্রের সেই ম্লান মুখে ভেসে ওঠা। তারপর রাত তিনটের প্রচণ্ড ঝড়। এইভাবে চলল প্রতিটি দিন। আর প্রত্যেক দিনের শেষ যন্ত্র গণকের সাহায্যে হিসেব-নিকেশ করার পালা। সৌভাগ্য, সবই অনুকূলে। যা চেয়েছিলাম সত্যিই তা হাতের মুঠোয়।

শেষের দিনে ডঃ রামচন্দ্রন ঠাঁই আমার পাশে বসে। একদিনে যেন শিশু হয়ে গেছেন তিনি। ওঁকে বললাম, ঘাবড়াবেন না। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞান একটা বড় রকমের

পাওনা থেকে বঞ্চিত হত, ডঃ রামচন্দ্রন। পুরনো মানুষের কথা বলতে গিয়ে, আপনিই তো খবরটা দিলেন? নইলে এ সুযোগের জন্যে মানুষকে কতদিন অপেক্ষা করতে হত, কে জানে?

অবশেষে আটদিনের শেষ দিনটিও গেল। তার পরের দিন চরম পরীক্ষার পালা।

পরদিন। সেই একই রকম প্রস্তুতি। একই রকম উদ্দীপনা নিয়ে রাত তিনটের অপেক্ষায় আমরা অধীব আগ্রহে বসে রইলাম।

দুটো পঁয়তাল্লিশ। পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন!

রাত তিনটে।

তাহলে কি? আত্মগতভাবেই প্রশ্ন করলাম আমি রেডিও টেলিস্কোপের পর্দার সামনে বসে।

কী ব্যাপার? ডঃ লয়েড, দয়া করে আপনার ঘড়িটা একটু দেখবেন কি?

কথাটা হয়ত আমিই জিগ্যেস করতাম। কিন্তু সাহস হল না। যদি এখনও পর্যন্ত তিনটে না বেজে গিয়ে থাকে, তাহলে?

ডঃ লয়েড বললেন, তিনটে বেজে পাঁচ—।

তিনটে বেজে পাঁচ—? তাহলে। এবার আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম আমি। ঠিক তাই, ডঃ বাসু। অনেকক্ষণ তিনটে বেজে গেছে।

ডঃ নিশুচি বললেন, তাহলে আজ আর ঝড় এল না?

না! আপাতত আর কোন দিনই আসবে না ডঃ নিশুচি! আমার কণ্ঠে প্রত্যয় ডঃ রামচন্দ্রন, এবার বাইরে যান। দলবল নিয়ে সারা বায়ার্ডে চষে ফেলুন। রাতে, দিনে। যখন তখন। সে শব্দ আব হবে না। মহাকাল দু ঘণ্টা আগে অন্য পথে সরে গেছে।

উৎসব!

বলতে পারেন উৎসব শুরু হল এর পর। ওই রাতে খাবার-দাবার বের করে আমরা ফিস্ট শুরু করে দিলাম। এবং তার আগে

তিনটে বেতার রিপোর্ট পাঠালাম। একটা ডেল ফুয়োগোতে। একটি জেনিভায় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থার চেয়ারম্যানকে। এবং তৃতীয়টি ভারতের বিজ্ঞান আকাদেমিকে। একই ভাষা—আমরা নিরাপদ। এক্স নক্ষত্রটি দু ঘণ্টা আগে দূরে সরে গেছে। অর্থাৎ বায়ার্ডের ঠিক মাথার ওপর না থেকে দশমিক শূন্য শূন্য তিন সেকেণ্ড কোণ দূরে। আমরা যা চেয়েছিলাম। পেয়েছি। বায়ার্ডে শব্দ জনিত অনর্থের কারণ এক্স নক্ষত্র।

ফিস্টের সময় আসল রহস্যটি ব্যাখ্যা করলাম আমি। যাঁরা আমার চারপাশে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা শুনলেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আসল ব্যাপার এই। এক্স-নামে যে নক্ষত্রটির কথা বললাম, মানে রেডিও টেলিস্কোপে যে নক্ষত্রটি সবাই আপনারা দেখেছেন, আসল অনর্থকারী সে। নক্ষত্রটির আসল ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে। গত তিন বছরের মত ওই নক্ষত্রটি ঠিক রাত তিনটের সময় বায়ার্ডের এই অঞ্চলটার ঠিক মাথার উপরে অবস্থান করছিল। আপনারা তো জানেন পৃথিবী থেকে দাঁড়িয়ে আকাশের নক্ষত্রগুলিকে মনে হয় পূব দিকে উঠে ক্রমে মাথার দিকে আসে, তারপর পশ্চিমে অস্ত যায়? ওই নক্ষত্র ঠিক রাত তিনটের সময় যে জায়গায় এখন আমরা দাঁড়িয়ে সেখানটার মাথার উপর হাজির হত। নক্ষত্রটি মৃত্যুমুখী। এখন তার মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটছে। ফলে শক্তিশালী কণা—তাদের মহাজাগতিক রশ্মিও বলতে পারেন, রাত তিনটের সময় সরাসরি এই অঞ্চলে এসে ভীড় করে। ডঃ নিগুচি নিশ্চয় দেখেছেন, ঠিক তিনটের সময় আমাদের কাউন্টার যন্ত্রে ওই সব কণার সংখ্যা কেমন বেড়ে যায়, তাই না? কিন্তু তার আগে অথবা পরে, তেমনটি ঘটে না। পৃথিবী আবর্তন করছে বলে তিনটের পর জায়গাটা মাথার ওপর থেকে সরে যায়।

কিন্তু এর ফল হয় সাংঘাতিক। এমনিতেই বায়ার্ডের বাতাস সাহারা মরুভূমির চেয়েও শুকনো। ফলে মহাজাগতিক রশ্মির মাত্রা

বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শুকনো বাতাস ভীষণ ভাবে আয়নিত হয়ে পড়ে। আয়নিত বাতাসের মধ্যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ ছুই রকমের চার্জই থাকে এদের সঙ্গে আবার হাত মেলায় পৃথিবী দক্ষিণ মেরুর চৌম্বক ক্ষেত্র। এর ফলে, ভীষণ ভাবে তড়িতাহত বাতাসের স্তরে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রবল বেগে সেই বাতাস ছুটতে শুরু করে চাপ কোথাও বাড়ে, কোথাও কমে। যেখানে কম চাপ সেখানকার তাপমাত্রাও কমে যায়। নেগেটিভ পজিটিভ ছটি বাতাসের স্তর দূর থেকে ছুটে এসে এখানেই মিলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ক্ষরণ। মেঘলা আকাশে যেমন বিদ্যুৎ চমকায় ব্যাপারটা কতকটা তেমনই। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়, যন্ত্রে ধরা পড়েছে ওই সময় সারা আকাশ প্রচণ্ড আলোর ঝলসানিতে মুহূর্তে ভেসে যায়? ঝলসানির পরই শব্দ। বিপদ এই, বায়ার্ড অত্যন্ত আর্দ্র জায়গা বলে এখানকার বরফের গা ভীষণ ভাবে মসৃণ। আর দেখছেন তো, চারপাশে উঁচু-নীচু কত সব বরফের পাহাড়? ওই পাহাড়গুলি থাকতে বিপদ হয়েছে আরও বেশি। প্রচণ্ড শব্দ ওই সব পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে অনুনাদ সৃষ্টি করে শব্দের প্রাবল্য ভীষণ ভাবে বাড়িয়ে দেয়। তার জন্যেই অত প্রচণ্ড শব্দ। এত তার ক্ষমতা

আশার কথা। নক্ষত্রটি দূরে সরে গেছে দু' ঘণ্টা আগে। এ সময়টা আমি কলকাতাতেই গণনা করে বের করেছিলাম। দেখছি মিলে গেল। নক্ষত্রটি কোন দিন আর তার পুরনো জায়গায় ফিরে আসবে না। তাই ওই শব্দ অন্ততঃ ওই নক্ষত্র থেকে সৃষ্টি হওয়ার আর কোন আশা নেই।

এ পর্যন্ত বলেই থামলাম আমি।

সারা তাঁবুতে সবাই তখন পাথরের মূর্তি।

এরপর বায়ার্ডে ছিলাম আমি ছদিন মাত্র। অনিবার্য কারণে আমাকে ফিরে আসতে হয়। তবে তার আগে জেনিভা থেকে কিছু

সাহায্য পাবার সুযোগ করে দিয়েছি ডঃ রামচন্দ্রনকে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা তাকে সাহায্য করবেন, বলেছেন। একমাত্র আমি ছাড়া সবাই রয়ে গেলেন।

ডঃ রামচন্দ্রনের সঙ্গে গত একমাস কোন যোগাযোগ করতে পারিনি। তবে অসমর্থিত একটি সংবাদে যেটুকু দেখেছি, তাতে জানা যাচ্ছে, তাঁর পুরণো ধারণা হয়ত ঠিক বায়ার্ডে না হলেও তার কাছেই বরফের প্রায় একশ মিটার নীচে একটি পুরনো কবর তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। ওই কবর থেকে পাওয়া একটি মানুষের করোটীর সঙ্গে ব্রাজিলের প্রাগৈতিহাসিক যুগেব মানুষের করোটির নাকি অদ্ভুত মিল। দেখা যাক। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়। জানি না, মানুষের আদি-অন্তের ইতিহাস উদ্ধারের জন্যে মানুষকে আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সবাইকে ছেড়ে বায়ার্ড থেকে ফিরে এলাম ঠিকই, কিন্তু মনটা আমার সেখানেই পড়ে রইল। সেই বরফ, সেই শিস, তাদের রহস্য— এ সব কথা ভেবে মাঝে মাঝেই মনটা আমার উড়ুক্কু হয়ে উঠছিল। কাজের চাপ বেড়েছিল এর পর খুবই। তবু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আর এক বারের জন্যেও সেখানে যদি যেতে পেতাম! আর একবার।

বছরখানিক কেটে গিয়েছিল এর পর। তারপর সত্যিসত্যিই আবার এক দুঃসাহসিক যাত্রা। আবারও এক ভয়ঙ্কব অভিজ্ঞতা।

হ্যাঁ, সেই বায়ার্ডেই।

শুনুন তা হলে। সবটুকু হয়ত আমি গুছিয়ে বলতে পারব না। খানিকটা ব্যক্তিগত কারণে। এবং কিছুটা কয়েকজন মানুষের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। তবে যে টুকু বলব, আমার বিশ্বাস, তা থেকে আমার মূল বক্তব্যটি আপনারা বুঝে নিতে পারবেন। তারপর যে কোন সিদ্ধান্ত আপনারা করতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। যদি

মনে করেন, একটা মাছের যা বুদ্ধি, মানুষ সভ্যতার চরম শিখরে উঠেও ততটুকু বুদ্ধি ধরতে পারে নি, আমি তার বিরোধিতা করব না। কারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি, যত হামবড়ায় আমরা করি না কেন, প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই এখনও শেখার আছে। বরং বলব, এ ব্যাপারে এখনও আমরা শিশু। কারণ বায়ার্ডে সেদিন যা ঘটেছিল সেটা নেহাতই তাৎক্ষণিক ঘটনা। আর যে ঘটনা তাৎক্ষণিক তা নিয়ে নিজের ক্ষমতা অক্ষমতার প্রশ্ন ওঠে না।

যা বলছিলাম। গত বছর মে মাসে দক্ষিণ মেরুর বায়ার্ড অঞ্চলের সেই ঘূর্ণিঝড় যেন এক বিভীষিকা। আপনারা যাঁরা মাটির পৃথিবীতে বাস করেন, বায়ার্ডের এই অঞ্চলটি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না। আগেই তে বলেছি বরফ, শুধু বরফ। যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেখানে শুধু বরফের স্তূপ। মাঝে মাঝে -বরফের পিঠ কুঁজো হয়ে উঠে গেছে আকাশ পানে। এক একটি পাহাড়ের মত। কখনও বা সেই পাহাড়ের পাশে বরফের সমভূমি, উপত্যকা। একটা ক্লান্তিকর নীরবতা সর্বত্র। মাঝে মাঝে সেই নীরবতা এত ক্লান্তিকর মনে হয়, আমরা তখন পরস্পারের মুখের দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠি। সেই চিৎকারের শব্দ মসৃণ বরফের গায়ে প্রতিফলিত হয় এমন এক ভৌতিক ধ্বনির সৃষ্টি করে, কী বলব, তখন মনে হয়, আমরা কেউ যেন মানুষ নই। এক একটি অশরীরী আত্মা।

হ্যাঁ। আমরা। আমরা পনেরজন। আমি, সুমিত্রা, মালহোত্রা, ডঃ মেনন, ডঃ শেকভ্ এবং ডঃ আকাউয়া। আমরা সবাই ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী। মেরু অঞ্চলের চৌম্বক ক্ষেত্র এবং সেখানকার বাতাসে অয়নের ঘনত্ব মাপার জন্যে প্রায় দশ দিন ধরে এক নাগাড়ে আমরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের নেতা প্রখ্যাত নোবেল বিজ্ঞানী অধ্যাপক গিয়াকিমি। বাকি সব কর্মী বলতে পারেন। রাত দিন চোখে আমাদের ঘুম ছিল না। মাথার ওপর চব্বিশ ঘন্টা সূর্যের

আলো। পায়ের নিচে স্ফটিকশুভ্র বরফের আঙিনা। আকাশের বুকে সূর্য যেন প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ।

মাঝে মাঝে পর্যায়ক্রমে তাঁবুর মধ্যে এসে আমরা বিশ্রাম করছিলাম। কখনও বা সে সব তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছিলাম তাদের নিয়ে আলোচনা। তার বাইরে জীবন বলে যে কোন বস্তু থাকতে পারে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম হয়ত। ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক। মেরু অঞ্চলে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে যে মুহুর্মুহু নাচন, বরফের বুকে সূর্যের আলোর যে রকমারী বর্ণালী, আমরা জানি তাদের রহস্য ভেদ করা সম্ভব হলে, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এক নতুন আশার দিগন্ত খুলে যাবে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

আমরা যেখানে তাঁবু বসিয়েছিলাম, আমরা ছাড়া আর কোন প্রাণী সেখানে আমাদের চোখে পড়ে নি। তাঁবু থেকে প্রায় তিন শ' গজ দূরে শক্ত বরফের মাঝখানে ছিল ছোট্ট একটি নালা। চওড়ায় প্রায় এক শ' ফুট। নালাটি অনুসন্ধান করে বের করেছিলেন ডঃ মেনন। আন্তর্জাতিক মেরু অনুসন্ধানের পক্ষ থেকে আমাদের এই বিজ্ঞানী দলটি সরাসরি দক্ষিণ আমেরিকার কেপ হর্ণ থেকে যাত্রা করেছিল মাস দুই আগে। মাঝি মাল্লা এব বিজ্ঞানী মিলিয়ে জাহাজের মোট যাত্রী প্রায় তিন শ'। আবহাওয়া মাপার জটিল যন্ত্রপাতি ছাড়া এই জাহাজে ছিল তিনটি হেলিকপ্টার, একটি প্লেন, দুটি বরফ কাটার বুলডজার এবং একটি ডুবো জাহাজ। আমরা আগে থেকেই জানতে পেরেছিলাম, ঠিক যে জায়গাটায় বসে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে, সেটি মুল সমুদ্র থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে। ঠিক হয় সমুদ্রে জাহাজ নোঙর করে আমাদের দলটি হেলিকপটারে চড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হবে। অসুবিধের কোন কারণ নেই এ জায়গাটি উপত্যকার মত মসৃণ।

বলতে পারেন, এই ভাবেই আমরা পরিকল্পনা করে এসেছিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদ সাধলেন ডঃ মেনন।

ডঃ মেনন বললেন, বায়ার্ডের যেখানে আমরা ঘাঁটি করব বলছি, জায়গাটা আমার চেনা। বছর তিন আগে একটি ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দলের সঙ্গে এখানকার বিস্তৃত অঞ্চলে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। দেখেছি, এখানে বরফ আছে ঠিকই। কিন্তু কখনও কখনও বরফের ফাঁকে দেয় ছোটখাটো নালা। সমুদ্র থেকে আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন না। কারণ, সমুদ্র থেকে ওই সব নালা বেশ কিছুটা দূরত্ব বরফের নিচ দিয়ে এগিয়ে যায়। পরে বরফ ভেদ করে ওপরে উঠে আসে।

ডঃ মেনন কথা বলছিলেন অধ্যাপক গিয়াকিম্নির ক্যাবিনে বসে। আমাদের জাহাজ একটি অশরীরী আত্মার মত নোঙর করে দাঁড়িয়ে। সেদিন ঘন কুয়াশায় চারপাশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। জাহাজের মাস্তুলের ওপর বসেছিল একটি অ্যালবাট্রোস পাখি। কয়েকটি সামুদ্রিক চিল। পাখিগুলি কেপ হর্ণ থেকেই জাহাজের আনাচে-কানাচে লেগে রয়েছে। এবার ওরা আমাদের সঙ্গী।

ডেকের ওপর ফারের জামা কাপড় চড়িয়ে দু একজন মাল্লা কী সব যন্ত্রপাতির কাজকর্ম দেখাশুনা করছিল। অধ্যাপক গিয়াকিম্নির ক্যাবিন থেকে ওদের আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

গিয়াকিম্নির ক্যাবিনে উপস্থিত ছিলাম আমরা সবাই। অর্থাৎ বায়ার্ডের বরফের উপর নেমে যাঁরা গবেষণা চালাবেন। আমাদের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি বলতে ডঃ গিয়াকিম্নি। বছর পাঁচ আগে মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে পৃথিবীর চুম্বকের অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়ার কথা বিশ্লেষণ করে ষাট বছরের এই বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারে বৃত হন। বাড়ি মিলানে। তবে জীবনের সবটাই তাঁর কেটেছে কখনও উত্তর মেরুতে। কখনও বা দক্ষিণ মেরুতে। তাঁর ধারণা, তাঁর তত্ত্ব আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে মানুষকে একদিন সাহায্য করবে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. সুমিত্রা মালহোত্রা

বিকিরণ বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করে এরই মধ্যে যথেষ্ট নাম করেছিল। বলতে পারেন, আমাদের দলের সেই একমাত্র কনিষ্ঠতম বিজ্ঞানী। এর আগে মহাকাশ প্রকল্পের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। এখন তার বয়স তিরিশ। ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে এত বেশি মনেব জোর বড় একটা দেখা যায় না। আর তার জন্যেই এ দলে কাজ করার জন্যে সে নির্বাচিত হয়েছিল। সুমিত্রা আমার সহকারী। ডঃ শেকভ্‌ ইউক্রেনের মানুষ। ডঃ আকাউয়া টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক। জাপানের যে কয়টি দল দক্ষিণমেরু অঞ্চলে গত দশ বছর ধরে গবেষণা চালাচ্ছেন, তিনি তাদের সঙ্গে জড়িত।

মেরু অঞ্চলে সকাল সন্ধ্যা বলে কিছু নেই। কারণ দিনের অথবা রাতের আলো বলতে যা বোঝায়, সেই একটানা প্রত্যূষ অথবা প্রদোষ। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে জীবনটাকে মিলিয়ে কখনও আমরা ঠিক করে নিচ্ছিলাম এই হোল ভোর বেলা। এই মধ্যাহ্ন। অথবা মধ্যরাত্রি।

যে সময়েব কথা বলছি, তখন আপনাদেব পৃথিবীতে বলতে পারেন সকাল।

ডঃ মেননের কথা শুনে অধ্যাপক গিয়াকিল্লি কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, আমি জানি, কি আপনি বলতে চান, ডক্টর। কিন্তু সেটা খুব ঝক্কির মত কিছু হবে না?

ডঃ মেনন বললেন, মেরু প্রদেশের প্রতিটি মুহূর্তই তো ঝক্কি নিয়ে বেঁচে থাকা, প্রফেসর। না। আমি খুব আশাবাদী নয়। তবে মনে হচ্ছে, এ ঝক্কিটা আমরা নিতে পারি।

তাহলে ব্যাপারটা আপনি খোলসা করেই বলুন। গিয়াকিল্লির প্রশ্ন।

ডঃ মেনন কফির কাপে চুমুক দিয়ে ক্যাবিনের দেয়ালে টাঙানো ম্যাপটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা নিশ্চুপ তাঁর কথাবার্তা শুনতে লাগলাম।

ম্যাপের ওপব লাঠির ডগা দিয়ে ডঃ মেনন বলতে শুরু করলেন,

এই যে, আমাদের জাহাজটা এখানে দাঁড়িয়ে। এখান থেকে এক শ' গজ দূরে লক্ষ্য করুন, হ্যাঁ, এই তো। যদি আমি ভুল না করি, করব না বলেই মনে হয়, কারণ গত বছর এ পথ ধরেই আমাকে চলতে হয়েছিল—তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি, এখানে একটি হ্রদের দেখা নিশ্চয় আমরা পাব।

হ্রদ? সুমিত্রার কণ্ঠে বিস্ময়।

হ্যাঁ, হ্রদ! মেনন বলে যেতে লাগলেন। আয়তনে আমাদের ডাল হ্রদের মত। হ্রদের জল গরম। এর নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে একটি উষ্ণ স্রোত। মে মাসের গোড়ায় এই হ্রদের ওপরকার বরফ গলে যায়। চারপাশে পড়ে থাকে বরফের স্তূপ। অধ্যাপক গিয়াকিন্নি—একটু থামলেন ডঃ মেনন!

বলুন। আমি শুনে যাচ্ছি। গিয়াকিন্নির উত্তর।

জাহাজের পেছন দিকের ফাঁড়িটার মধ্যে দিয়ে ডুবো জাহাজে করে আমরা এগিয়ে গিয়ে ওই হ্রদে গিয়ে পড়ব। তারপর সোজা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলে আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যাব ওই বরফের পাহাড়টার ঠিক গোড়ায়।—ডঃ মেনন আর একবার থামলেন।

বলে যান! রেশ ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন অধ্যাপক গিয়াকিন্নি।

আর সব শ্রোতা তখন পাথরের নীরবতা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ডঃ মেননের কথা শুনে চলেছেন। একটু থামলেন ডঃ মেনন। হয়ত কি ভেবে নিলেন।

শুনুন, ডঃ গিয়াকিন্নি, শুরু করলেন ডঃ মেনন। -এই যে বরফের পাহাড়টা দেখছেন, আমি হলফ করে বলতে পারি স্থলপথে এটিকে অতিক্রম করা বলতে পারেন একেবারেই অসম্ভব। অথচ যে জায়গায় গিয়ে আমাদের গবেষণা চালাতে হবে, সেখানে যেতে হলে এই বরফের পাহাড় আমাদের অতিক্রম করতেই হবে!

আমরা কি হেলিকপটরের সাহায্য নিতে পারি না? আমার প্রশ্ন।

জানি, ডঃ বাসু। আমার প্রশ্ন শুনে মন্তব্য করলেন ডঃ মেনন। —জানি, হেলিকপটরই একমাত্র পথ। তবু এক্ষেত্রে হেলিকপটর

কোন কাজেই লাগবে না। কারণ, আজ ১৮ ডিসেম্বর। এ সময়ে ওদিকটায় অদ্ভুত এক ধরনের ঝড় শুরু হয়। রহস্যজনক ঝড়। গতবার ওই ঝড়ের মধ্যে পড়ে খুবই বিপদে পড়তে হয়েছিল আমাদের। ঝড়ের সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ। আমরা বলি বরফের আর্তনাদ। শিস। এক নাগাড়ে একের পর এক শিস। বায়ার্ডের আকাশ বাতাস সেই শিসে মুখরিত হয়ে ওঠে। মনে হয় ওই শিস আমাদের মগজের মধ্যে তীক্ষ্ণ তীরের মত ঢুকে গিয়ে পাগল করে দেবে।

মানে ? ডঃ আকাউয়ার কণ্ঠে বিস্ময়।

নিয়েৎ ! ইমপসিবল। ডঃ শেকভ্।

আপনি বলে যান, ডঃ মেনন। শিসের ব্যাপারটা আমার জানা আছে তার রহস্য উদ্ধার করাও তো আমাদের গবেষণার একটি অঙ্গ গিয়াকিম্নি।

অতএব বুঝতেই পারছেন, স্যার! ডঃ মেনন শুরু করলেন। —প্রথমত ঝড়ের আশঙ্কা। তেমন কিছু ঘটলে হেলিকপটর নামানর প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, যদি তেমন শিসের দৌরাত্ম্য চলে তুম করে সেখানে উপস্থিত হওয়াটাও বিপজ্জনক নয় কি ?

তাহলে আপনার মতলবটা কি, বলুন ? আমার প্রশ্ন।

খুবই সহজ। ম্যাপটির দিকে তাকাল। এই যে হ্রদের এদিকটা পাহাড়ের নিচে এসে শেষ হয়ে গেছে, ঠিক এইখানে, এক শ' ফুট নিচে নেমে যান, জলের নিচে বলছি। দেখবেন, প্রায় পঞ্চাশ ফুট সুড়ঙ্গ। ওই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে চলে গেছে উষ্ণ জলের স্রোত। প্রায় আধ মাইল। অসুবিধে কিছু নেই। ডুবো জাহাজে চড়েই এ পথটুকু আমরা পাড়ি দিতে পারব। একবার আমি গিয়েও ছিলাম, ডঃ গিয়াকিম্নি। —তারপর দেখবেন, আমরা একটা খুদে নদীর মধ্যে হাজির হয়েছি। আর সেই নদীপথে এগোলেই গন্তব্যস্থলে আমরা পৌঁছে যাব। ডঃ মেনন এমন ভাবে কথাগুলি বলে গেলেন, ভাবটা এই, এ আর এমন কি শক্ত কাজ।

কিন্তু আমাদের মুখ তখন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ব্যাচারা সুমিত্রা যেন আরও নির্জীব।

অধ্যাপক গিয়াকিন্নিব মুখ দেখে ঠিক কী তিনি ভাবছেন, বোঝা গেল না।

ক্ষণিক নীরবতা।

বুঝতে পাচ্ছি, এত বড় ঝক্কিটা আপনারা নিতে চান না। কথা বললেন ডঃ মেনন।

তা এসব ক্ষেত্রে কে না একটু ভেবে দেখতে চায়, বলুন। নিজেদের ইচ্ছেয় জ্যান্ত কববস্ত হতে নিশ্চয় কেউ চায় না।? কথা বললেন ডঃ আকাউয়া।

ডিজনির ছবিতে এমন ধবনের ঘটনা দেখেছি। সভ্য মানুষরা নৌকোয় করে স্রোতের টানে ছুটে চলেছে। পেছনে তাদের ধাওয়া কবেছে বর্বর কোন উপজাতি। সভ্য মানুষদের নিয়ে হঠাৎ এক সুড়ঙ্গের মধ্যে নৌকোটি ঢুকে গেল। উঁচু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সেই সুড়ঙ্গ। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পাহাড় ফুঁড়ে ওরা আবার বেরিয়ে এল। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, আমরা তো ঠিক সিনেমার নায়ক নায়িকা নই। এতক্ষণ পর কতকটা আত্মগত ভাবেই যেন ছোট খাটো একটি বক্তৃতা দিয়ে বসল সুমিত্রা।

অধ্যাপক গিয়াকিন্নি বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটার তাৎপর্য। দুর্ধর্ষ মানুষ। মেরু অঞ্চলেব আনাচে কানাচেয় বিপদ, এ তাঁর জানা। যে জায়গাটায় আমরা অনুসন্ধান করতে চলেছি, তিনি জানতেন সেখানে যাওয়ার পথে বিপদ অনেক। হয়ত দিন পনের আগে পৌঁছতে পারলে এ ধরনের ঝক্কিও তাঁকে নিতে হত না। কারণ, ওই সময় এ অঞ্চলে ঝড়ের সম্ভাবনা ছিল কম। হয়ত হেলিকপটরে চড়েই পাহাড় টপকেই গন্তব্যস্থলে তাঁরা যেতে পারতেন। কিন্তু পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। কেপ হর্ণ থেকে যে পথ ধরে তাঁরা জাহাজটি চালিয়ে আনছিলেন, তার সামনে হঠাৎ একটি হিমশৈল এসে পড়ায়, তাকে বাঁচিয়ে পথ চলতে গিয়ে এই দেরি।

ডঃ শেকভ্ বললেন, আপনি কিছু কথা বলুন প্রফেসর।

আমার কথা, ডঃ মেনন যা বলছেন, তা মেনে চলা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই, ডঃ শেকভ্। কারণ একটিই। যে গবেষণার জন্যে এখানে আমরা উপস্থিত, তার গুরুত্ব যে কত, আপনারা জানেন। আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে এর জন্যে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ হয়েছে। তা ছাড়া, যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করব বলে আমরা অনুমান করছি, যা বারো বছর অন্তরই শুধু একবার ঘটে, ঝক্কির কথা ভেবে নিশ্চয় আমরা তাকে উপেক্ষা করতে পারি না। সুমিত্রা এবং ডঃ বাসু, নিজেদের কথা আপনারা ভাবুন তো? সেবার মহাকাশ যানে চড়ে ঊর্ধ্বাকাশে গবেষণা চালানর সময় দূর গ্রহ জগতের সেই ভৌতিক মানুষগুলি আপনাদের যানটিকে লোপাট করার চেষ্টা করছিল, বলুন, তখন আপনাদের যে মানসিক অবস্থা, যে ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল, এ ঝক্কি কি তার চেয়েও বেশি?

ডঃ গিয়াকিন্নির কথা শুনে মৃদু হাসলাম আমি এবং সুমিত্রা।

মনে মনে ভাবলাম, সে যে কত বড় ঝক্কি সে কথা আপনিও অনুমান করতে পারবেন না, অধ্যাপক গিয়াকিন্নি।

অর্থাৎ, সিদ্ধান্তে পৌঁছনর জন্যেই কথা শুরু করলেন অধ্যাপক, আমাদের সামনে এখন দুটি পথ। এক, এমন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সুযোগ আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। দুই, ডঃ মেনন যে পথে আমাদের এগিয়ে যেতে বলেছেন, সেই পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

ধন্যবাদ, প্রফেসর। ডঃ মেনন মৃদু হাসলেন।

স্বীকার করছি, গোড়ায় সবাই আমরা যথেষ্ট ভয় পেলেও শেষ পর্যন্ত ডঃ মেননের নির্দেশ আমরা পালন করেছি। মনে পড়ে, সেটা ২০ মে। আমাদের গবেষণা জাহাজ 'সাউথ পোল' নোঙর করে দাঁড়িয়ে রইল। আর আমরা বিজ্ঞানীরা সঙ্গী সাথী নিয়ে ডুবো জাহাজে নেমে পড়লাম।

ডুবোজাহাজের ক্যাপ্টেন এডিসন লী। মার্কিন মুলুকের লোক। মার্কিন দেশের পোলাবিস নামে পারমাণবিক শক্তি চালিত ডুবো জাহাজে কিছুদিন তিনি নেভিগেটরের কাজ করেছিলেন। ওই সময় আলাস্কার উত্তরে প্রায় তিরিশ মাইল চওড়া একটি বরফের পাহাড়ের নিচে দিয়ে একবার তাঁকে পোলাবিসকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

এডিসন লীর বয়েস বছর চল্লিশ। তিনিই আমাদের মনোবল জুগিয়ে বললেন, কোন ভয় নেই মশায়রা। এ যা করতে চলেছি বলতে পারেন আমাদের কাছে ছেলে খেলা। পোলাবিসে যা করেছিলাম আপনারা ভাবতেও পারবেন না। আমাদের ক্যাপ্টেন ছিলেন ডোনাল্ড স্মিথ। অমন বেপরোয়া মানুষ জীবনে আমি দেখিনি। হ্যাঁ, সেই আলাস্কার ব্যাপারটা, বুঝলেন কিনা, আমরা আগে থেকে কেউ ভাবতেই পারি নি। সমুদ্রের নিচে দিয়ে এগিয়ে চলেছি এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে বললেন, শোন লী। এবার একটা কাণ্ড ঘটবে। উত্তর মেরুর যে দিকে আমাদের যাওয়ার কথা, আমার ধারণা ছিল ওখানে ফাঁকা জলই পাব শেষ পর্যন্ত আমরা। কিন্তু হায় ভগবান! জল কোথায়? এ সবই তো বরফ! বরফের পাহাড় সারা সমুদ্র জুড়ে ভাসছে। ক্যাপ্টেন স্মিথ বললেন, থামলে চলবে না। এর নিচ দিয়ে চল আমরা এগিয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত আমরা তাই করলাম। হ্যাঁ, এই যে আমি একটা আস্ত বরফের পাহাড়ের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে পোলাবিসকে ওপারে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তুললাম।

জবর বক্তৃতা, বাবা! মনে মনে বললাম আমি আর বললাম তুমি বাবা আল্লা। তোমার মত বুকের পাটা আমরা পাব কোথায়?

না। কোন বিপদ হয়নি। ডঃ মেননের নির্দেশ মত এবং এডিসন লীর কৃতিত্বে বায়ার্ডের সেই বরফের পাহাড়ের নিচে দিয়ে সত্যিই আমরা বহাল তবিয়তে গিয়ে উঠলাম আমাদের মূল ঘাঁটিতে।

তারপর এক এক করে সাত দিন কেটে গেল। একের পর এক চলতে লাগল অনুসন্ধানের কাজ।

সে যে কি শক্ত কাজ, কী বলব। মূলখণ্ডের পরিবেশে বসে আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। প্রথম দিনটিতে মনে হল, এ আমরা এলাম কোথায়? শুধু বরফ। তার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ঘন কুয়াশা। রোদ্দুরের আলো সেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অনেক কষ্ট করেই যেন পৌঁছচ্ছিল সেখানে। আমরা সবাই সাধারণ পোশাকের ওপর এক প্রস্থ করে চামড়ার পোশাক পরে নিয়েছিলাম। এ ছাড়া, বাইরে কাজ করার সময় পরতে হচ্ছিল খুব পাতলা নাইলনের জামা এবং জ্যাকেট। অবশ্য চামড়ার তৈরি পোশাকের ভেতরে। পাতলা নাইলন জ্যাকেটের বুনোনের মধ্যে দিয়ে বোনা ছিল খুব সূক্ষ্ম তারের জাল। জ্যাকেটের মধ্যে ব্যাটারি। ব্যাটারির বিদ্যুৎ-এ সেই জাল গরম করার ব্যবস্থা ছিল! অর্থাৎ বলতে পারেন, প্রত্যেকেই আমরা শরীরের ওপর একটি করে ইলেকট্রিক হিটার চাপিয়ে চলাফেরা করছি।

মূল তাঁবু থেকে প্রায় তিনশ' মিটার ব্যাসের জায়গা জুড়ে বসান হল একটি করে নাইলনের আধার। আধারগুলি দেখতে ঠিক কফিনের মত। আমার এবং সুমিত্রার কাজ ছিল এক একটি আধারের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে ক্যামেরার সাহায্যে মেরুর আকাশের ছবি তোলা। ডঃ মেনন এবং ডঃ আকাউয়া চৌম্বক ক্ষেত্রের ম্যাপ তৈরি করতে লাগলেন। আর ডঃ শেকভ এবং গিয়াকিন্নি কাউণ্টার দিয়ে সেখানকার বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অয়ন কণার মাত্রা মাপতে লাগলেন।

হ্যাঁ। আমরা সবাই যেন যন্ত্র। এক একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে রুটিন মাফিক কাজ করে চলেছি। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছি, শুধু ততটুকুই, যতটুকু না বললে চলে না। এখানে দিন রাতের হিসেব জুগিয়ে চলেছে হাতের ঘড়ি। ঘড়ি দেখে আমরা ঘুমোচ্ছি, খাওয়া দাওয়া করছি।

বলতে পারেন, প্রথম তিনদিন ভালভাবেই কেটেছিল আমাদের। সন্ধের দিকে ডুবো জাহাজ থেকে লী এসে আমাদের তাঁবুতে আড্ডা জমাতেন। আর কত রকমের গল্পই না তাঁর ঝুলির মধ্যে ছিল। বলতে পারেন ভদ্রলোক বেশ জমিয়ে রেখেছিলেন আমাদের।

কিন্তু চতুর্থ দিন থেকে শুরু হল নানান উপসর্গ।

ভোরে ব্রেকফাস্টের সময় দেখা গেল সুমিত্রা অনুপস্থিত।

ডঃ গিয়াকিম্নি বললেন, কী ব্যাপার? দেখুন তো ডঃ বাসু, আপনার ছাত্রী ডঃ মালহোত্রা আবার এত দেরি করছে কেন?

সুমিত্রা গবেষণা করেছিল আমার কাছে। সেই সুবাদে আমার ছাত্রী। আমার থেকে বছর ছয়েকের ছোট। ওকে আমার ভাল লাগত তিনটি কারণে। অমন ধৈর্য, সহনশীলতা এবং কোমল স্বভাবের মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। ব্রেকফাস্টের টেবিলে, বলতে গেলে, সব দিন প্রথম হাজির হোত সে-ই। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে খানিকটা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না।

ডঃ গিয়াকিম্নিকে বললাম, দেখি, ওর আবার শরীর খারাপ হল কী না! মেয়েদের ব্যাপার তো।

বলেই সুমিত্রার তাঁবুতে গেলাম।

ঠিক যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই, বিছানার ওপর সুমিত্রা তখনও শুয়ে। দেখে মনে হল, যেন তখনও গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন।

খানিকটা অবাকই হলাম। এমন তো হয় না? কানের কাছে অ্যালার্ম বেজেছে। অথচ সুমিত্রার ঘুম ভাঙে নি। এ কেমন কথা?

এগিয়ে গিয়ে সুমিত্রার কপালে হাত রাখলাম।

না। জ্বর হয় নি।

ডাকলাম, সুমিত্রা!

সুমিত্রা সাড়া দিল না।

আবার ডাকলাম। সেই সঙ্গে হাত ধরে ঝাঁকুনিও দিলাম।

সুমিত্রা এবার একটু নড়ে উঠল !

তারপর, হ্যাঁ, বলতে পারেন এমন মুহূর্তগত ভাবে যে কোন কিছু বুঝে ওঠার আগে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরল সে। এমন ভাবে জড়িয়ে ধরল, তাকে ছাড়ান দায়। বিশ্বাস করুন, পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, সে আতঙ্কিত। ভয়ে তার দু'চোখ যেন বসে গেছে। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে।

কী ব্যাপার, সুমিত্রা ?

এমন অভাবিত ঘটনায় আমি হকচকিয়ে উঠলাম।

সুমিত্রা কোন কথা বলল না। বরং আরও সজোরে আমাকে আঁকড়ে ধরল যেন। একেবারে শিশুর মত।

সুমিত্রার চিৎকার পাশের তাঁবু থেকেও শোনা গিয়েছিল। শব্দ শুনে সবাই এসে হাজির হলেন। এবং এই অবস্থায় আমাদের দেখে মুহূর্তের জন্যে কারোর মুখে কোন কথা সরল না।

আমার অবস্থাটা ভাবুন একবার। হতে পারি আমরা বিজ্ঞানী। তবু সুমিত্রা মেয়ে। বয়েস কম। তাতে আবার সুন্দরী। সবার সামনে তাকে বক্ষ লগ্ন করে এভাবে দাঁড়িয়ে—অত শীতেও আমার শরীরে ঘাম দেখা দিল।

হতভম্ব আর সবাইও।

ডঃ গিয়াকিন্নি বললেন, গুড গড্! হোয়াটস রং ডঃ বাসু ?

আমারও সেই একই প্রশ্ন, ডঃ গিয়াকিন্নি। সংক্ষেপে উত্তর দিলাম আমি—সুমিত্রার তাঁবুতে এসে দেখি সুমিত্রা ঘুমচ্ছে। জ্বরটর এলো কি না দেখার জন্যে ওর কপালে হাত রাখতেই কেমন পাগলের মত লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল। তারপর এই ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমার কথা শুনে ডঃ গিয়াকিন্নি খানিকটা গম্ভীর হলেন। তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল অপূর্ব এক পিতৃসুলভ করুণা। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সুমিত্রার মাথায় হাত রাখলেন।

এক মিনিট বিরতি।

তাঁবুর মধ্যে এক অশরীরী নিস্তব্ধতা!

আমি জানতাম, এমন একটা কিছু ঘটতে পারে! পেছন থেকে অস্ফুট কণ্ঠে কথা বললেন ডঃ মেনন।

তার মানে?

আমি এবং সবাই চমকে উঠলাম।

আপনি কি বলতে চান, ডঃ মেনন? অধ্যাপক গিয়াকিমির প্রশ্ন।

মে বি, ইট ইজ ডিউ টু কসমিক পার্টিকল। কতকটা স্বগতোক্তির মতই শোনাল ডঃ মেননের কণ্ঠস্বর

কী সব আবোল তাবোল বকছেন? ডঃ শেকভ্।

আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে একটু আসুন তো, ডঃ শেকভ্। বলেই কতকটা হিড় হিড় করে টানতে টানতেই ডঃ শেকভ্‌কে নিয়ে ডঃ মেনন সুমিত্রার তাঁবুর বাইরে চলে গেলেন, খাওয়ার সময় বলে গেলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। সুমিত্রাকে ধীরেসুস্থে আপনারা বিছানার ওপর শুইয়ে দিন। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

হলও তাই।

ডঃ মেনন কি বলে গেলেন, সেটা বুঝে ওঠার আগে আমাদের মনে হল সুমিত্রাকে সুস্থ করে তোলা আগে আমাদের দরকার।

ধরাধরি করে সুমিত্রাকে তার বিছানার ওপর নিয়ে গিয়ে শোয়ালাম।

ইতিমধ্যে আমাদের দলের ডাক্তার পিটার স্মিথকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর তাঁবুতে বসে খুব ভোর থেকেই আমাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কতকগুলি তথ্য পরীক্ষা করে দেখছিলেন। বছর পঞ্চাশ বয়েসের এই ভদ্রলোকের বাড়ি টেকসাসের অস্টিন শহরে। খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু সেটা তাঁর বাইরের চেহারা। ভেতরে আস্ত একটি রসাল তরমুজ। প্রচণ্ড পরিশ্রমী, খুঁতখুঁতে। দক্ষিণ মেরুতে

এর আগেও কয়েকবার এসেছেন তিনি। তাঁর ধারণা, এ হলো, সুস্থ মানুষদের পাগল করে তোলার জায়গা।

মনে পড়ে 'সাউথ পোল' জাহাজের ক্যাবিনে বসে ডঃ স্মিথ কয়েকবার এ কথা বলেছিলেন।

ডঃ শেকভ্ সে কথা শুনে মন্তব্য করেছিলেন, আপনি ঠিক কি বলতে চান, ঠিক মালুম হচ্ছে না ডঃ স্মিথ।

ডঃ স্মিথ বলেছিলেন, আমার কথা খুব সোজা। আরে মশায়, মানুষ তার সাঙ্গপাঙ্গ না নিয়ে একা বেঁচে থাকতে পারে? আপনার নিজের কথাই ভাবুন না কেন। আপনি আসছেন কাজাগস্তান থেকে। ভাবুন তো একবার, কি সুন্দর পরিবেশই না কাজাগস্তানের। রঙ বেরঙ পোশাক পরে মানুষের চলাফেরা, কত রকমের গাছপালা, পশুপাখি, সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। সারা দিন ধরে চলে পশুপাখি, মানুষের হট্টগোল। ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রঙ পাল্টায়।

মাঝপথে আমি মন্তব্য করলাম, ডঃ স্মিথ, আপনি দেখছি একটা সাচ্চা কবি।

আমরা সবাই কবি, ডঃ বাসু। মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন ডঃ স্মিথ। এসব যাদের মনে ভালবাসা জাগায় না, তারা বেঁচে থাকতে জানে না। আসলে এই সব ভালবাসে না, এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে বলে আমি জানি না। - যা বলছিলাম, আমরা যে দেশে চলেছি, তার কিছুই নেই সেখানে। কল্লোলিনা প্রকৃতি সেখানে যেন নিষ্প্রাণ পাথরের স্তূপ। বৈচিত্র্য? ছ্যাঃ। শুধু বরফ আর প্রতি মুহূর্তে এই বুঝি প্রাণ গেল, এমন ভাবনা নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে, মশায়? বলবেন হয়ত, বিপদ আছে ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর মানুষকে বাঁচানর জন্যেই তো ভয়ঙ্কর এই মেরু রাজ্যে আমরা এসেছি? আপনারা কি বলবেন জানি না মশায়, আমার কথা, পৃথিবীর মানুষের বেঁচে থাকার কথাই যদি বললেন, তা হলে আমার প্রশ্ন, সেই মানুষগুলির মধ্যে কি আমরা পড়ি না?

ডঃ স্মিথের কথা শুনে তাঁর প্রতি আমি সশ্রদ্ধই হয়ে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, তিনি শুধু ভাল চিকিৎসকই নন, একজন দার্শনিকও বটেন। মানুষের প্রতি যাঁর ভালবাসা অসামান্য। হয়ত এটাই তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। মেরু অঞ্চলে প্রচুর তেল, খনিজ পদার্থ এ সব রয়েছে। তাদের উদ্ধার করতে পারলে পৃথিবীর মানুষ উপকৃতই হবে। কিন্তু ইতিহাস থেকে দেখা যায়, যেন উল্টোটাই হয় শেষ পর্যন্ত। সম্ভার যত বাড়ছে, মানুষ নিজের কাছ থেকেই তত বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে জীবন ধারণ চলে, বাঁচা যায় না।

বলতে কি, ডঃ স্মিথকে আমার দারুণ ভাল লেগেছিল সে দিন।

বায়ার্ডে এসে দেখলাম, তিনি বেশির ভাগ সময় একাই থাকতে চান যেন। শুধু সন্ধের দিকে এক ঘণ্টার জন্যে আমাদের সঙ্গে বসতেন। তখন রাতের খাবারের সময়। বসেই প্রথম দিকে এক এক করে আমাদের কার শরীরটা কেমন যাচ্ছে বলে যেতেন। অতঃপর শুরু হত গল্প। সেখানেও দেখতাম, তিনি পরকে দিয়ে গল্প বলাতে পছন্দ করতেন বেশি। আর যখন কেউ কথা বলত, তখন মাঝে মাঝে ছোট্ট এক একটি মন্তব্য করতেন। রসিক মন্তব্য। তরমুজের রসের মতই রসাল। খুব ভাল লাগত আমাদের।—তারপর গল্প শেষ করে চলত এক প্রস্থ স্বাস্থ্য পরীক্ষার পালা। এ কাজটি তিনি করতেন সকালে এবং সন্ধেয় দু'বার।

ডঃ স্মিথ তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন সুমিত্রাকে। আর আমরা পাথরের মত দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে রক্তের চাপ, ই. সি. জি. এ সব রুটিন পরীক্ষা শেষ হল।

ডঃ স্মিথ বললেন, সামান্য স্নায়বিক দৌর্বল্য। সেরে উঠবেন এক্ষুনি, ভাবনা নেই। তারপর সুমিত্রার পাশে বসে তার মাথার দু'পাশে মৃদু ম্যাসাজ করতে লাগলেন।

তাতে ফল হল।

মিনিট পনেরর মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল সুমিত্রা।

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরতেই, আশপাশে আমাদের ভিড় দেখে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল সুমিত্রা। বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল।

ডঃ স্মিথ বললেন, একটু পরে উঠবেন, ডঃ মালহোত্রা। চিন্তার কারণ নেই।

আমি দুঃখিত, ডক্টর। আপনাদের ওপর অত্যাচার হয়ে গেল অনেকটা। কুণ্ঠার সঙ্গে উত্তর করল সুমিত্রা।

দ্যাটস অল রাইট এমনটি আমাদেরও ঘটতে পারত।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? কেন এমন হল?

ঘণ্টা দুয়েক পর তার উত্তর দিল সুমিত্রা।

আর সব বিজ্ঞানীরা তখন যে যাঁর কাজে ব্যস্ত। নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে সবাই পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সুমিত্রা এবং আমি শুধু তাঁবুর মধ্যে বসে। ডঃ স্মিথের উপদেশেই আমাকে থাকতে হয়েছিল। আমাকে আড়ালে ডেকে তিনি বলেছিলেন, আপনার ছাত্রী। অতএব ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা আপনার পক্ষেই সব চাইতে সোজা হবে। গল্প গল্প করে ওকে আপনি একটু চাঙা করে রাখুন

সুমিত্রা বলল, কেন এমন হল আমি তা বলতে পারব না, ডঃ বাসু। জানি না, ঠিক কখন, মনে হয় ভোরের দিকেই হবে। কারণ ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজার শব্দ আমি শুনেছিলাম। বিছানা থেকে উঠব। এমন সময় মনে হল, আমার চোখের সামনে সমস্ত যেন অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে খুদে খুদে আলোর স্ফুলিঙ্গ। এক একটা স্ফুলিঙ্গ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছে। কখনও বা ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথাটা ঘুরে উঠল আমার। হঠাৎ ওই সময় মনে হল একটা বিরাট ছায়া, একটা দানবের মত মানুষ যেন আমাকে

গ্রাস করতে ছুটে আসছে। হঠাৎ দৃষ্টিটা কেমন স্বচ্ছ হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। দেখলাম, আপনি আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে—কথাটা আর শেষ করল না সুমিত্রা। লজ্জায় তার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল।

জানি। যে ভাবে জড়িয়ে ধরেছিলে আমাকে, যেন দৈত্যের সামনে পড়া শিশু। হাল্কা সুরে কথা বললাম আমি।

এরপর কিছু হাল্কা রসিকতা, অর্থহীন কিছু গল্পগুজব। সুমিত্রা বিছানার ওপর শুয়ে। মাঝে মাঝে ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। কখনও বা মাথার দু'পাশটা ম্যাসেজ, যেমন করছিলেন ডঃ স্মিথ। মানব সভ্যতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সেই বরফের পরিবেশ, সেই একান্ত নির্জনতায় তাঁবুর মধ্যে আমরা শুধু দু'জন। বাইরে যাঁরা তাঁরা এক একটি যান্ত্রিক মানুষ। বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা। কিন্তু ভেতরে আমরা দু'জন। অদ্ভুত অসহায় সুমিত্রা। আর যতখানি সম্ভব আমি তাকে মনোবল জুগিয়ে চলেছি। আর এই প্রথম আমার মনে হল, মানুষের পরিপূর্ণ আশ্রয় যদি কিছু থাকে, তবে সে আশ্রয় মানুষের মধ্যেই আছে। মানুষই মানুষের একমাত্র আশ্রয়, অর্থ, যশ, বিদ্বান, ক্ষমতা—দূর, দূর। এ সব বাজে কথা।

দর্শন চিন্তা থাক।

দুপুরের মধ্যেই সুমিত্রা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল।

সন্ধের দিকে ডঃ স্মিথ মেডিকেল রিপোর্ট পেশ করলেন। তাতে দেখা গেল শরীরের দিক দিয়ে সুমিত্রা সুস্থ। সকালের দিকে তার মস্তিষ্ক কোষের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দেখা গিয়েছিল। হ্যাঁ, এটাই অস্বাভাবিকতার কারণ।

ডঃ গিয়াকিম্নি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এমনটি হওয়ার কারণ কি?

সঠিক বলা শক্ত। ডঃ স্মিথের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ডঃ মেনন বললেন, আজ সকালের দিকে সুমিত্রার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের বাতাসের ওপর ডঃ শেকভ্ এবং আমি পরীক্ষা

চালিয়েছিলাম। আমাদের কাউন্টারে আমার যতদূর মনে হচ্ছে আমি ত একটি মহাজাগতিক কণা দেখতে পেয়েছি।

ইউ মিন, কসমিক পারটিকল্? ডঃ গিয়াকিল্লির কণ্ঠে বিস্ময়।

ঠিক তাই। বললেন ডঃ মেনন।

প্রাইমারি অর সেকেণ্ডারি। ডঃ আজাউয়ার প্রশ্ন।

প্রাইমারি বলেই তো মনে হয়। ডঃ মেনন।

হরিবল! ডঃ গিয়াকিল্লির কণ্ঠে বিস্ময়।

কী করে এটা সম্ভব? আজ সারাদিন এখানকার চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে তেমন কোন অস্বাভাবিকতা তো লক্ষ্য করি নি? ডঃ আজাউয়ার প্রশ্ন।

জানি না, আপনি কি দেখেছেন, ডঃ আজাউয়া। তবে হ্যাঁ, ডঃ শেকভ, আপনার কি মনে হয় না, যা আমরা দেখেছি সেটা ঠিক? ডঃ মেনন।

ডঃ শেকভ্ বললেন, ভুল করেছি বলে তো মনে হয় না?

হুঁ! গম্ভীর হলেন ডঃ গিয়াকিল্লি।

এর তাৎপর্য যে কি সে কথা সবাই আমরা জানি। জানি, এরপর আমাদের ঝক্কি নিয়ে এখানে চলাফেরা করতে হবে। কিন্তু—

ঠিক মাঝপথে এখানকার কাজকর্ম ছেড়ে চলে যাওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না, ডঃ মেনন। আপনি আগামীকাল একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন তো। খানিকটা আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার জন্যেই যেন কথা বললেন ডঃ গিয়াকিল্লি।

কথাটি ঠিক। প্রচুর ঝক্কি এবং যথেষ্ট খরচ এমন ধরনের এক একটি অভিযানে। মাঝপথে তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরেও তো যাওয়া চলে না।

চলে না ঠিকই। কিন্তু পরদিন থেকে যা শুরু হল তারপর অনেকেই আর আমরা আশাবাদী হতে পারি নি।

তখন সকাল প্রায় পাঁচটা। ডঃ গিয়াকিল্লির চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল আমার। পড়ি কি মরি করে তাঁর ঘরে আসতেই দেখি অনেকে

আগে থেকেই সেখানে হাজির। শুধু বিজ্ঞানীরাই নয়। যাঁরা অন্যান্য কর্মী তাঁরাও। একটি শয্যার ওপর শুয়ে রয়েছে নির্জীবের মত আমাদের ইলেকট্রিসিয়ান আলবার্তো। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ডঃ স্মিথ।

হ্যাঁ। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ সুমিত্রার যা হয়েছিল তাই।

আলবার্তোর বন্ধু ক্রিস্টোফাব বলল, গতকাল রাতে পানীয়র মাত্রাটা একটু বেশিই চড়িয়েছিল আলবার্তো। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ভোরের দিকে উঠে উন্মাদের মত চিৎকার শুরু করে দেয় সে। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল পানীয়েরই জের চলছে। কিন্তু সমস্ত জামা কাপড় খুলে উদোম অবস্থায় যখন সে বরফের ওপর ছোটাছুটি করার জন্যে জবরদস্তি করতে শুরু করল স্যার, আমরা তখন দারুণ নার্ভাস হয়ে গেছি।

ডঃ স্মিথ দেখে শুনে বললেন, ঠিক আছে। এখন তুমি থামো দেখি বাপু। বলেই ফার্স্ট এইড দিলেন।

যখন আমরা কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম, সেই ফাঁকে ডঃ গিয়াকিম্নি ডঃ মেননকে নিয়ে কখন যে বাইরে চলে গেছেন আমরা টের পাই নি। ডঃ স্মিথের চেষ্টায় আলবার্তো ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। তারপর একে একে নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যা বলল তার বিবরণ সুমিত্রার অভিজ্ঞতারই মতন।

না। কথাটা ঠিক তা নয়। এ ধরনের উপসর্গের সঙ্গে আমরা কেউই পরিচিত নাই। জলবিহীন বরফ রাজ্যে একাকীত্ব বোধ, শুনছি মানুষকে নাকি মাঝে মাঝে পাগল করে তোলে। কিন্তু আপাততঃ তেমন সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে কোথায়?

সন্ধের দিকে এ সব নিয়েই আলোচনা করলাম আমরা।

কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলায় হঠাৎ আমি যেন আবিষ্কার করলাম, এতক্ষণ আমরাই শুধু এক তরফা কথা বলে চলেছি। আর আমাদের

মধ্যে যে দু'জন লোক মূক হয়ে বসে রয়েছেন তাঁরা ডঃ গিয়াকিন্নি এবং ডঃ মেনন।

ডঃ আকাউয়া ব্যাপারটা হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বললেন, দাঁড়ান মশায় আপনারা। এতক্ষণ অনেক তত্ত্বই তো হলো। এবার আপনারা একটু সবুর করুন। বরং, হ্যাঁ ডঃ মেনন কিংবা স্যার গিয়াকিন্নি, দয়া করে আপনাদের মুখের কুলুপ একটু খুলুন।

ডঃ আকাউয়ার এমন একটি প্রশ্নে পুরো তাঁবুটির মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে নেমে এল এক পাথরের স্তব্ধতা।

সবাই দেখলেন, নিমেষের জন্যে চমকে উঠলেন ডঃ গিয়াকিন্নি এবং ডঃ মেনন। ওঁরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। বোঝা গেল এ সব ঘটনা সম্পর্কে কিছু একটা অনুমান ওঁরা করেছেন। হয়ত, এসবের কারণ কী, তা নিয়ে মাথাও ঘামিয়েছেন ওঁরা।

ডঃ আকাউয়া বললেন, দোহাই আপনাদের, ডঃ গিয়াকিন্নি, ডঃ মেনন, দয়া করে কিছু বলুন। কারণ, ডঃ মেনন, পরশু দিন আপনিই কি যেন বলেছিলেন না? মহাজাগতিক কণা, এমন কিছু যে ঘটতে পারে আপনি অনুমান করতে পেরেছিলেন—আপনিই তো এ সব কথা বললেন! ডঃ শেকভকে টেনে নিয়ে কাউন্টার দিয়ে কি সব করলেন আপনি। তারপর থেকেই দেখছি, এ ব্যাপারে আপনি আর কোন কথাই বললেন না।

বলেছিলাম। কিন্তু হিসেবটা আমি এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারি নি। তাছাড়া মহাজাগতিক কণা সম্পর্কে যা আমি তখন বলতে চেয়েছিলাম, তারপর এমন কিছু—মানে আপনাদের বলার মত তেমন কিছু ঘটে নি।—বললেন ডঃ মেনন। কারোরই বুঝতে অসুবিধা হল না, তাঁর কণ্ঠে যথেষ্ট আড়ষ্টতা। কি যেন লুকনোর চেষ্টা করছেন তিনি।

এবং আর কেউ কোন প্রশ্ন করার আগেই ডঃ গিয়াকিন্নি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন।

তাঁর পাশে বসে ছিল সুমিত্রা। তার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে স্নেহ

কোমল স্বরে বললেন—এখন কেমন মনে করছো সুমিত্রা ? গতকাল রাতে ঘুমের নিশ্চয় ব্যাঘাত হয় নি তোমার ?

সুমিত্রা মাথা নেড়ে জানালো, না কোন অসুবিধে হয় নি।

ডঃ আকাউয়া বুঝতে পারলেন ডঃ গিয়াকিম্নি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন। আসল প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন না। কিন্তু মুশকিল হলো প্রবীন এই বিজ্ঞানীর ব্যক্তিত্ব এত বেশি প্রচণ্ড যে তাঁকে ফিরে প্রশ্ন করার সাহসও তিনি পেলেন না। যদিও বোঝা গেল কোন একটি ব্যাপার তিনি লুকিয়ে রাখতে চান। যার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কিছু সম্পর্ক রয়েছে।

ডঃ স্মিথকে লক্ষ্য করে ডঃ গিয়াকিম্নি আবার প্রশ্ন করলেন, বলুন ডঃ স্মিথ, সুমিত্রা এবং আলবার্তোর ব্যাপারস্যাপার দেখে আপনার কি মনে হয়, কোন বিপজ্জনক কিছু ঘটতে পারে।

ডঃ স্মিথ আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, কি ঘটতে পারে, সেটা কি করে বলব বলুন ?

না, আমার তা প্রশ্ন নয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম, এ পর্যন্ত যাই ঘটে থাকুক না কেন, আপনার কি মনে হয় এরপর পাততাড়ি গুটিয়ে এখান থেকে আমাদের এখুনি চলে যাওয়া উচিত ? আপনি ডাক্তার। দক্ষিণ মেরুর অভিজ্ঞতা আপনার প্রথম নয়। এ সব জায়গায় এলে শরীর এবং মনের ওপর চাপ পড়ে বেশী। তার ফলে অনেক জটিল অভিজ্ঞতাও আমাদের পোহাতে হতে পারে ?—ডঃ গিয়াকিম্নির প্রশ্ন। সে তো অবশ্যই। বললেন ডঃ স্মিথ।

ওদের পরীক্ষা করে এখন কি কোন অস্বাভাবিকতা আপনি দেখতে পেয়েছেন ? —না। ডঃ স্মিথের উত্তর।

দ্যাটস রাইট। ডঃ গিয়াকিম্নির মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর ডঃ আকাউয়ার দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা দু একদিন সবুর করুন, ব্যাপারটা আমাকে একটু দেখতে দিন।

সেদিনের মত বৈঠক শেষ হল।

ডঃ গিয়াকিন্নির তাঁবু ছেড়ে আমরা যে যার নিজের আস্তানায় ফিরে এলাম। শুধু ডঃ মেনন তাঁর কাছে থেকে গেলেন।

এর পরবর্তী চারদিন স্বাভাবিক ভাবেই কেটে গেলো। ওই ধরনের দুর্ঘটনা তেমন ঘটেনি। ডুবো জাহাজ পোলারিসের ক্যাপটেন লী যথা নিয়মে আমাদের মধ্যে এসে আসর খানিকটা সরগরম করতে লাগলেন। সুমিত্রা এবং আলবার্তোর ঘটনা শুনে বললেন, এ সব কিছুই না। আইস সিকনেস। নাবিকদের যেমন সী সিকনেস হয়, তেমন। আমরাও এসব কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কারণ তখন দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল গবেষণার কাজে।

কিন্তু সাত দিনের দিন শুরু হলো আবার এক বিপর্যয়। ডঃ আকাউয়া জানালেন আমরা যেখানে রয়েছি সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্র হঠাৎ যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মনে হচ্ছে চৌম্বক ঝড় উঠবে! গম্ভীর কণ্ঠে সংবাদটা তিনি দিলেন ডঃ গিয়াকিন্নিকে।

রাত তখন দুটো। অবশ্য ঘড়ির রাত। কারণ আগেই বলেছি দক্ষিণ মেরুতে তখন চলছিলো একটানা দিন।

ডঃ আকাউয়া কী একটা শব্দে জেগে উঠলেন।

দেখলেন খাটের পাশের ম্যাগনেটোমিটারের সঙ্গে লাগান কমপ্যুটারের টেপ দ্রুত কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে বেজে চলেছে দ্রুত বাজিং শব্দ।

বিছানা ছেড়ে যেন লাফিয়ে উঠলেন ডঃ আকাউয়া।

সর্বনাশ! এ যে রাক্ষুসে ব্যাপার! কয়েক ঘণ্টা আগেও তো এমনটি ছিল না?

হ্যাঁ, জেগে গিয়েছিলেন ডঃ মেনন এবং ডঃ শেকভও। ওঁদের কাউণ্টার যন্ত্রও ততক্ষণে বিপদজ্ঞাপক সংকেত বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। আর কাউণ্টার-এর পর্দার ওপর শুরু হয়ে গেছে ছোট্ট ছোট্ট সবুজ আলোক বিন্দুর নাচন।

দুজনেই তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন কমপ্যুটারের কাছে। কমপ্যুটার তখন প্রচণ্ড চঞ্চল। এক নাগাড়ে কাগজের টেপের ওপর ছেপে চলেছে কাউণ্টারের কীর্তিকলাপ।

মুহূর্তের জন্য দুজনেই সন্ত্রস্ত।

ডঃ মেনন বললেন, বাতাসে তেজস্ক্রিয় কণার সংখ্যা বাড়ছে।

কিন্তু তাঁর কথাটা শেষ হতে না হতেই যেন চেঁচিয়ে উঠলেন ডঃ শেকভ্,—না, না! এই মাত্র অদ্ভুত এক ধরনের কণা,—আমি ভুল করিনি, ডঃ মেনন, ঠিক পর্দার ওই কোণ দিয়ে তেমন একটি কণার ছবিই তো ছুটে গেল বলে মনে হল?

কি বললেন? সত্যিই কি তেমন কিছু চোখে পড়েছে আপনার? ডঃ মেননের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

কিন্তু ডঃ শেকভ্‌কে আর উত্তর দিতে হলো না। কারণ এরপর হঠাৎ শুরু হয়ে গেল সেই ভৌতিক কণার ফোয়ারা। অবশ্য, মাত্র দুই সেকেণ্ডের জন্য বলতে পারেন।

আর পরক্ষণেই চিৎকার করে ডঃ মেনন ছুটে গেলেন ডঃ গিয়াকিন্নির তাঁবুতে। কি ব্যাপার? ডঃ মেননের ডাকে বিছানা ছেড়ে ধড়মড় করে জেগে উঠলেন ডঃ গিয়াকিন্নি।

এগেইন দোজ ষ্ট্রেঞ্জ পারটিকল্‌স! উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠলেন ডঃ মেনন।

ইউ মিন, দোজ কসমিক পারটিকল্‌স, সিনর? ডঃ গিয়াকিন্নির কণ্ঠে বিস্ময়।

নিশ্চয়!

তাহলে বলুন, আমরা ভাগ্যবান। একটা প্রচণ্ড সুযোগ হঠাৎ আমাদের হাতে না চাইতেই এসে গেলো। ডঃ গিয়াকিন্নি কথাগুলো এমন ভাবে বললেন যেন কত সুখবরই না তিনি শুনলেন।

আপনি কি বলতে চান এরপরও আমাদের এখানে থাকা উচিত?

নিশ্চয়। কেন নয়? ডঃ গিয়াকিন্নির কণ্ঠে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।

কিন্তু সেটা কি মারাত্মক রকমের একটা ঝক্কি হবে না?

জানি। মারাত্মক রকমের ঝক্কি। কিন্তু বিজ্ঞানের বড় রকমের কোন গবেষণা ঝক্কি না নিয়ে এ পর্যন্ত কে করতে পেরেছে, বলুন ডঃ মেনন?

আমি ঠিক তা বলছি না, ডঃ গিয়াকিন্নি। আমার প্রশ্ন, সব কিছু জেনে শুনেও, এবং সুমিত্রা, আলবার্তোর ব্যাপারটা যখন চোখের সামনে ঘটতে দেখলাম, সেখানে এতগুলি মানুষের জীবন নিয়ে খেলা কি ঠিক উচিত হবে?

জানি। কিন্তু এত বেশি উচিত অনুচিতের কথা ভাবলে মানুষকে এখনও পর্যন্ত বন্যপ্রাণী হয়েই বেঁচে থাকতে হতো, ডঃ মেনন। বিজ্ঞানের অনেক সম্ভাবনাকেই বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। সেসব ভাবলে চলে না। বলছি না, এ ক্ষেত্রে তেমন বিপদ আমরা মেনে নিতে চলেছি।

আপনি ঠিক কি বলতে চান, আমি বুঝতে পারছি না, ডঃ গিয়াকিন্নি।

তাহলে আমার পরিষ্কার কথাটা শুনুন। দক্ষিণ মেরুর মহাজাগতিক রশ্মির পরিবেশে এখনও পর্যন্ত কেউ কাজ করেন নি। এই প্রথম আমরা তার সুযোগ পেলাম। এখানকার চৌম্বক পরিবেশ এবং মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে তার সঠিক কি সম্পর্ক সেটা যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, ভাবুন ভবিষ্যতের মানুষের পক্ষে এখানে এসে ব্যাপক ভাবে বাস করাটা তখন শক্ত হবে কি? কারণ তখন আমরা বলে দিতে পারবো, কি ভাবে চললে এখানে ঝক্কি না নিয়েই বাঁচা চলে। আর তেমনটি হলে, ভেবে দেখুন, এখানকার বরফের নিচে হয়ত চাপা রয়েছে অফুরন্ত তেলের ভাণ্ডার, প্রচুর ধাতব সম্পদ। বলুন, ভবিষ্যতের জনসমাকীর্ণ পৃথিবীর জন্যে এ সবের প্রয়োজন আছে কি না? আমার অনুরোধ আপনি একটু দয়া করে ধৈর্য ধরুন।

না। ডঃ গিয়াকিন্নি যেন অনড় পাথর। ডঃ মেননের পক্ষে তাঁকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বলতে কি, তাঁর ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের করোরই ছিল না।

পরদিন বায়ার্ডের চেহারাটাই পালটে গেলো।

আকাশ এবং বাতাস ঘন কুয়াশায় ঘিরে তৈরি করে বসলো যেন রকের পরিবেশ। সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেলো। পরিবর্তে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো অদ্ভুত আলোকিত পরিবেশ। মনে হলো সূর্যকে নিংড়ে তার সমস্ত আলো যেন সেখানকার কুয়াশার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালে তার প্রভা যেমন সারা মেঘটিকে আলোকিত করে তোলে, সেই রকম একটা ব্যাপার এখানকার পরিবেশেও ঘটতে লাগলো। সেই সঙ্গে শুরু হল কান ফাটানো শিসের শব্দ।

সে যে কি দারুণ শিস্, আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। তার সূচীভেদ্য শব্দ যেন মগজকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

ডঃ আকাউয়া বললেন, তেজস্ক্রিয় রশ্মির ঝড় উঠবে এর পর। সেই রশ্মির বর্ষণ চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে এই শিস তৈরী করছে। আমাদেব সাবধান হওয়া দরকার। মনে হচ্ছে সূর্যে কোন বিস্ফোরণ ঘটেছে। তার ফলেই এখানে এত বেশি তেজস্ক্রিয় রশ্মির সমাবেশ।

হ্যাঁ, ডঃ গিয়াকিন্নির বাহাদুরী আছে বলতে হবে। বিপর্যয়ের মধ্যে অমন মাথা ঠাণ্ডা করে কেউ যে কাজ করতে পারে, তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি সমস্ত বিজ্ঞানী এবং কর্মীদের নির্দেশ দিলেন, আপনারা কানে ঠুলি পরে নিন। ঠুলির নিচে হেডফোন। এবার থেকে আমরা নিজেদের মধ্যে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে কথাবার্তা চালাবো। কোন অসুবিধা নেই। প্রত্যেকের সঙ্গে ছিলো ছোট ছোট রেডিও সেট। অতএব অসুবিধের কারণ নেই।

এ ছাড়া প্রত্যেকে পরে নিলেন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধকারী পোশাক। বিশেষ ধরনের প্লাষ্টিকের তৈরী। আর পুরো মাথাটা

ঢেকে নেয়া হলো পুরু প্লাস্টিকের টুপিতে। এই টুপির মধ্যে ছিলো বিশেষ ধরনের ধাতুর তৈরি চাদর। যা কোন কোন মহাজাগতিক রশ্মিকে প্রতিহত করতে পারে।

ডঃ গিয়াকিন্নি ক্যাপটেন লীকে জানিয়ে দিলেন, আপনার পোলারিসকে অন্তত: দশ মিনিট জলের নিচে ডুবিয়ে রাখুন। শুধু জলের ওপর রেডিও অ্যান্টেনাটি ভাসিয়ে রাখলেই চলবে। তার সাহায্যেই আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। হ্যাঁ, প্রস্তুত থাকবেন প্রতি মুহূর্তের জন্যে। প্রয়োজন হলে বিনা নোটিশে এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হতে পারে।

তারপর ক্ষিপ্রগতিতে শুরু হয়ে গেল আমাদের পর্যবেক্ষণের কাজ। রেডিও অফিসারের ওপর দায়িত্ব রইলো পোলারিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার।

কী বলব আপনাদের! আমরা যেন একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি। দিন যত বাড়তে লাগলো আমাদের চারপাশটা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠলো। এতক্ষণ ছিল বুক ফাটানো শিস্। চৌম্বক ঝড় এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মির স্রোত। এবার শুরু হলো বাতাসের ঝড। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গতি বাড়তে লাগলো। আর আমরা, ডঃ গিয়াকিন্নির নির্দেশে এক এক জায়গায় বসে চালিয়ে যেতে লাগলাম পর্যবেক্ষণের কাজ। সুমিত্রা এবং আমি এক জায়গায় বসে ইলেকট্রনের ঘনত্ব মেপে চলেছি।

হ্যাঁ। ঝড় যে মানুষকে কতটা পাগল করে তুলতে পারে এই প্রথম বুঝতে পারলাম। ঝড়ের গতিবেগ বাড়ল পাঁচ ঘন্টার মধ্যে।

সুমিত্রা ফিস্ ফিস্ করে বললো, মনে হচ্ছে আরও বাড়বে। বাতাস তেজস্ক্রিয় বিকিরণে দ্রুত অয়নিত হচ্ছে। অয়নিত বাতাসের কণা পরস্পর ধাক্কা মেরে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই এত বেগে বাতাস বইছে।

আমি বললাম, পাগলা গিয়াকিন্নির পাল্লায় পড়ে কী যে হবে বুঝতে পারছি না।

সুমিত্রা গম্ভীর হলো। মনে হলো কাউন্টারটির মধ্যে সে তখন ডুবে থাকতে চায়।

বলতে কি খাওয়া দাওয়া আমরা ভুলে গেছি। আমরা সবাই তখন পাগল।

অতিক্রান্ত হলো আরও দুটি ঘণ্টা। আর তখনই ঘটলো সেই দুর্ঘটনা।

বিল বললো, বাতাসের চাপ দারুণ ভাবে নেমে যাচ্ছে। এরপর এখানে আর টিকে থাকা যাবে না। এটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়ের সংকেত।

ডঃ গিয়াকিম্নি বললেন, ঠিক আছে। সবুর করো।

ডঃ আকাউয়া জানালেন, চৌম্বক ক্ষেত্র এবার প্রচণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

জানি। তেজস্ক্রিয় কণার ঝড় বেড়েছে বলেই এমনটি হচ্ছে। আপনি ভালো করে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্যাটার্ণটির ওপর নজর রাখুন। বললেন ডঃ গিয়াকিম্নি।

ডঃ মেনন হন্তদন্ত হয়ে এরপরই ছুটে এলেন ডঃ গিয়াকিম্নির কাছে।

কী ব্যাপার, সিনর? এনি ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট? ডঃ গিয়াকিম্নির প্রশ্ন।

ডঃ মেননের সারা মুখ তখন ফ্যাকাশে। তিনি নির্বাক।

কথা বলুন, ডঃ মেনন। আপনিও কি ঘাবড়ে গেলেন? বললেন ডঃ গিয়াকিম্নি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ডক্টর। যদি আমার যন্ত্রটি বিগড়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে বলবো, আমাদের চারপাশে এবার প্রাথমিক মহাজাগতিক কণার আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।

ইমপসিবল্! কই, আমার যন্ত্রে তো তেমন কিছু দেখছি না? চেক্, চেক্। প্লিজ চেক্।

ডঃ মেনন তখন পাথর। কারণ তিনি জানেন, ভুল তিনি করেন নি।

আরে, আমার যন্ত্র তো কাজই করছে না? পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠলেন ডঃ গিয়াকিম্নি।

তার মানে? চমকে উঠলেন ডঃ মেনন।

তাইতো। ডঃ গিয়াকিন্নির যন্ত্র তো থেমে রয়েছে। তার গায়ের ওপরকার লাল আলোটি নিভে গেছে।

কুড়ি গজ দূরে ছিলো বৈদ্যুতিক ব্যাটারির প্যানেল। ডঃ গিয়াকিন্নি এবং ডঃ মেনন তখনই সেখানে ছুটে গেলেন।

গিয়ে দেখলেন, ব্যাটারির দায়িত্ব যার হাতে সে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার পায়ের কাছে ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার। সম্ভবতঃ পড়ে যাওয়ার সময় পায়ের ধাক্কায় তারটি ছিঁড়ে গিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ।

লোকটির নাম এস্টার। সে মুখ থুবড়ে পড়ে। তার মাথার ওপরকার মহাজাগতিক রশ্মিরোধক টুপিটি খুলে পড়ে রয়েছে।

ডঃ গিয়াকিন্নি বললেন, কী ব্যাপার এস্টার?

এস্টার তাঁর কথায় চিৎকার করে বললো, বরফের ওপর হঠাৎ পা ফসকে পড়ে গেছি, স্যার।

তার কণ্ঠস্বর অস্ফুট। বোঝা গেল প্রচণ্ড লেগেছে তার। কথা বলার ক্ষমতা নেই।

কথা বলবে কি, এ তো দেখছি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে! বললেন ডঃ মেনন।

ডঃ মেনন তাড়াতাড়ি তার মাথায় টুপিটি পরিয়ে দিলেন। যদিও বুঝতে দেরি হলো না, সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে! মুখ দেখেই সেটা বোঝা গিয়েছিল।

বুঝতে পেরেছিলেন ডঃ গিয়াকিন্নিও।

ওভার একস্পোজার? ডঃ গিয়াকিন্নির প্রশ্ন।

একজ্যাক্টলি। ডঃ মেননের কণ্ঠস্বর এবার রূঢ়।

আর ঠিক এই সময় রেডিও অপারেটার হিহং হন্তদন্ত হয়ে জানালেন ডঃ গিয়াকিন্নি, ক্যাপ্টেন লী এইমাত্র জানালেন, পোলারিস জলের যেখানে এখন রয়েছে, না, তেমন কোন গোলমাল নেই স্যার। ক্যাপ্টেন

লী শুধু এটুকু বলতে বললেন, এই মাত্র তিনি এক ঝাঁক মাছ দেখতে পেয়েছেন সেখানে। তাঁর মনে হলো কোন কারণে ভয় পেয়ে সেখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে গরম জলের মোহনার দিকে পালিয়ে গেল তারা।

কী বললেন? হিহংকে আর শেষ করতে দিলেন না ডঃ মেনন। —জলের মাছ পালিয়ে গেল?

ডঃ গিয়াকিন্নির মুখও এবার যেন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। তিনি নির্বাক।

তাহলে বুঝতে পারছেন, স্যার। আমার যন্ত্র অকেজো হয়ে যায় নি? হতাশা এবং রূঢ়তায় ডঃ মেনন নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন যেন।

হিহং অবাক!

আপনি কিছু বলছেন, ডঃ মেনন? প্রশ্ন করলেন তিনি।

খুব সোজা কথা অফিসার। আপনি দয়া করে ক্যাপটেন লী কে জানিয়ে দিন এই মুহূর্তে বায়ার্ড ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। পোলারিসকে তিনি যেন প্রস্তুত রাখেন। বললেন ডঃ মেনন।

বিল জানালো, ঝড়ের গতি এখন ঘণ্টায় নব্বই মাইল। ঝড় আরও বাড়বে। ঘূর্ণি মাইল তিরিশ দূরে। এদিকেই আসছে।

জাহান্নামে যাক আপনার ঘূর্ণি! সব গুটিয়ে এখুনি বেস ক্যাম্পে চলুন। এ জায়গা ছেড়ে এখুনি চলে যেতে হবে। আদেশের সুরে কথা বললেন ডঃ মেনন। খবরটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো।

এরপর এস্টারকে বয়ে নিয়ে সবাই দ্রুত চলে এলাম পোলারিসে। ক্যাপটেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কোন যন্ত্রপাতিই আমরা নিয়ে আসতে পারি নি। কিছু টুকিটাকি ছাড়া আমাদের তাঁবু এবং সমস্ত কিছুই সেখানে পড়ে রইল।

ডঃ গিয়াকিন্নি নিশ্চুপ।

আমরা সবাই।

লীর কৃতিত্ব আছে। নির্ভীক নাবিক নিরাপদে আমাদের সবাইকে আমাদের জাহাজ 'সাউথ পোল'-এ পৌঁছে দিলেন।

অতঃপর ফেরার পালা।

যাত্রা পথের প্রথম দুই দিন কোন কথা বলেন নি ডঃ গিয়াকিন্নি। শুধু দিনে তিনবার এস্টারের ক্যাবিনে এসে মুমূর্ষু এস্টারের দিকে চেয়ে থেকেছেন। তারপর আবার ফিরে গেছেন নিজের ক্যাবিনে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার মত সাহসও কারও হয় নি। বলতে কি আমরাও যেন তখন এক একটি পুতুল।

তিন দিনের দিন ডঃ গিয়াকিন্নি ডঃ স্মিথকে শুধু প্রশ্ন করলেন, কী মনে হচ্ছে ডক্টর ?

ডঃ স্মিথ বললেন, ইট ইজ টু আরলি টু মেক এনি কমেণ্ট, স্যার।

জানি, আমার ভুলেই এমনটি হল। বলেই সেই যে তিনি নিজের ক্যাবিনে গিয়ে ঢুকলেন, সারাদিন সেখান থেকে আর বের হলেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা কি ? প্রশ্ন করেছিলাম ডঃ মেননকে।

ডঃ মেনন বললেন, ডঃ গিয়াকিন্নির একগুঁয়েমির জন্যেই বিপদটা হলো ডঃ বাসু। শুধু এস্টার নয়। আমাদের সবারই এই হাল হতো। সুমিত্রা এবং আলবার্তোর ভাগ্য ভালো। অল্পেতে বেঁচে গেছে। আসলে গোড়াতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে দিন সুমিত্রা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বুঝতে পেরেছিলাম বায়ার্ডের বাতাসে মহাজাগতিক রশ্মির আনাগোনা চলছে। গোড়ায় তার পরিমাণ কম ছিলো। ওই মহাজাগতিক কণা—পরিমাণ অবশ্য খুবই কম, তারই দু একটি সুমিত্রার মাথার খুলি ভেদ করে তার মস্তিস্কে গিয়ে ঢোকে। ঢোকার পর মস্তিষ্ক কোষে এমন ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়, যার ফলে সুমিত্রার ওই দিন অমন অবস্থা হয়েছিল। মাত্রা বেশি হলে সে মরে যেতেও পারতো। এবং একই হাল হয় আলবার্তোর। বলতে পারেন, শুধু ওদের দুজনেরই অমন হল কেন ? এর উত্তর, ব্যাপারটা চান্সের মত। গোড়ায় বাতাসে ওই কণার সংখ্যা ছিলো কম। এক মুঠো ঢিল ছুঁড়ে দিলে যেমন সব জায়গায় গিয়ে পড়ে না, বিশেষ বিশেষ জায়গায় গিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ওই কণাগুলি সবার মগজে ঢুকতে পারে নি। শুধু

ওদের চলার পথে যাকে যাকে পেয়েছে তার মগজে গিয়ে ঢুকেছে।

পরদিন তো আপনি এবং ডঃ শেকভ কাউণ্টার দিয়ে পরীক্ষাও করেছিলেন চারপাশের বাতাস,— ?

করেছিলাম। এবং আমি যে নির্ভুল ডঃ গিয়াকিম্নিকে তা বলেও ছিলাম। কিন্তু গবেষণার নেশা তখন তাঁকে এমন পেয়ে বসেছে যে আমার কথায় তিনি কান দেন নি। বরং ব্যাপারটা তখনকার মত চেপে যেতে বলেন। বললেন ডঃ মেনন।

কী সর্বনাশ! আমার কণ্ঠে বিস্ময়।

সর্বনাশ আরও হতো, ডঃ বাসু। সূর্য থেকে যে প্রচুর মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ চলছে, সে দিন ঝড়ের সময় আমি তা ধরতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম ওসব টুপিতে শেষ পর্যন্ত কাজ হবে না। ডঃ গিয়াকিম্নি আমাকে তখন আমল দিতে চান নি। কিন্তু বেচারা এস্টার! বরফের ওপর পা ফসকে যাওয়ায় তার যন্ত্রটি অকেজো হয়েছিল যেমন, আবার তার টুপিটি খুলে যাওয়ায় তার মাথার মধ্যে এসে ঢোকে প্রচুর পরিমাণ মহাজাগতিক কণা। তাই সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার অবস্থাটা দেখেই গিয়াকিম্নি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ভুল করছেন। আর যখন জানলেন, মাছের ঝাঁক পালিয়ে যাচ্ছে, তখন আমিও বুঝলাম ভুলটা কি সাংঘাতিকই না হয়েছে। আসলে প্রাথমিক মহাজাগতিক কণা জলের মধ্যেও প্রবেশ করে। প্রকৃতিজাত অভিজ্ঞতায় মাছগুলি তা বুঝতে পেরেছিলো বলেই অমন ভাবে পালিয়ে যায়। এ সব না ঘটলে, আমরাও রেহাই পেতাম না না, ডঃ বাসু।

এরপর কোন কথা বলতে পারি নি আমি। 'সাউথ পোল' তখন দক্ষিণ আটলান্টিকের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার মাস্তুলের ওপর বসে সমুদ্রের চিলরা শব্দ করে নিজেদের মধ্যে কি কথা বলছিলো। আমার মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগলো বায়ার্ডের সেই পাহাড়। আর রাক্ষসী ঘূর্ণি ঝড়ের আগ্রাসী চেহারা।